বাংরিপোসির দু'রাত্তির

বুদ্ধদেব গুহ

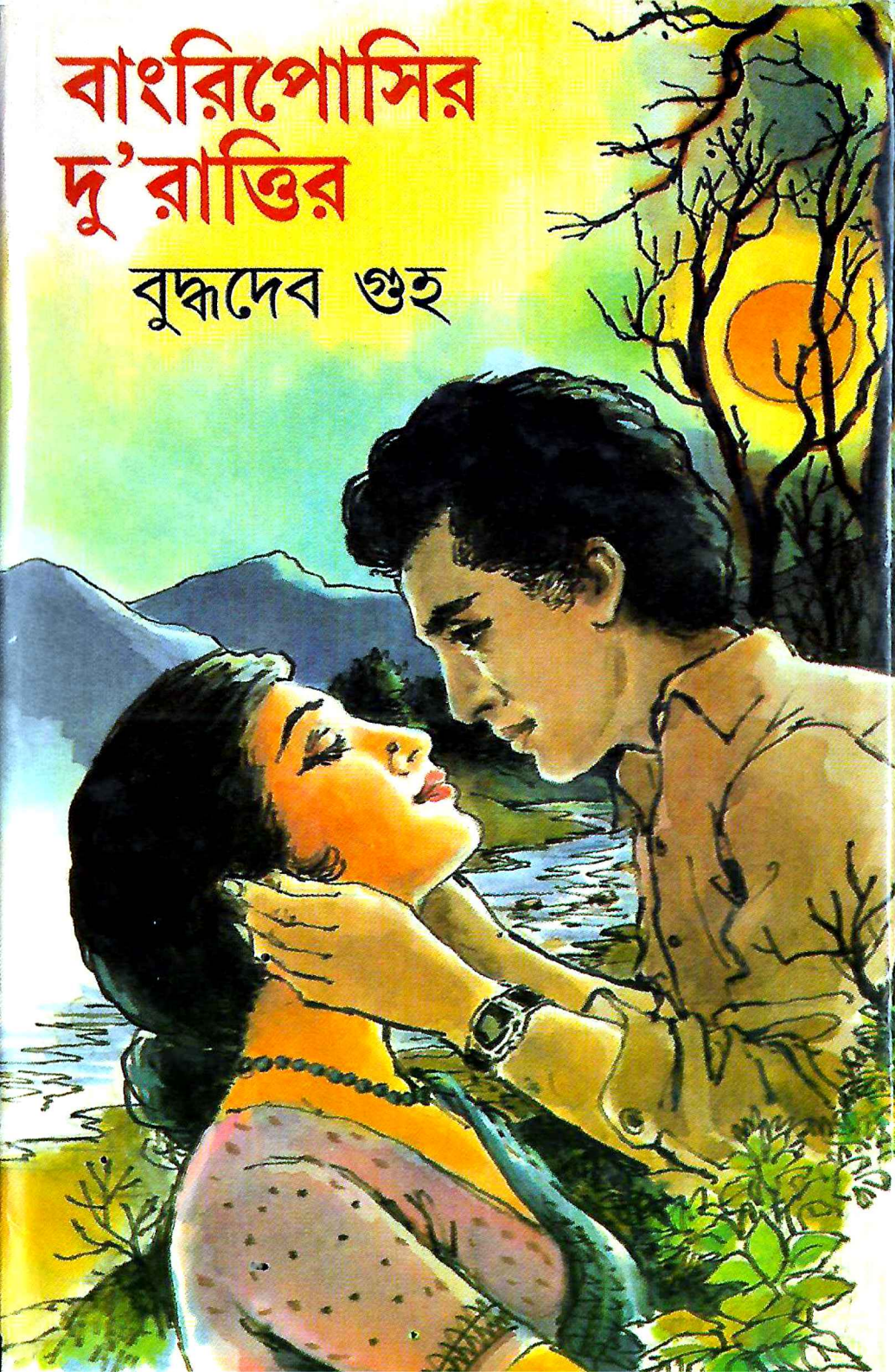

কুন্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দ্যেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অস্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যান্ডস কে - যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পাবেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন - subhajit819@gmail.com.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

বাংরিপোসির
দু'রাত্তির

বহড়াগড়া—ঝাড়ফুকুরিয়া

বহড়াগড়া বাংলো থেকে দুপুরের খাওয়া দাওয়া করে একটু বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়েছিলো ওরা চারটে নাগাদ। ঝাড়ফুকুরিতে ন্যাশনাল হাইওয়ে বাঁয়ে ফেলে ঢুকেছিল বাংরিপোসির রাস্তায়। আস্তেই চালাচ্ছিল অরি। ওরা তো বেড়াতেই বেরিয়েছে উইক-এণ্ডে। তাড়া নেই কোনো।

তোমাকে দিয়ে যদি একটা কাজও হয়!

বিরক্তির সঙ্গে গাড়িটা ব্যাক গিয়ারে ফেলে, অরি বলল পিকুকে।

পিছনের সীটে বসা কিশা টিপ্পনী কাটল, যা বলেছেন অরিদা।

নির্জন পথে অরি গাড়িটা কিছুটা ব্যাক করে নিয়ে গিয়ে বাঁদিকের পথে ঢুকলো সেকেণ্ড গিয়ারে।

পিকু ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, আমি ওসব পারি না।

বাঁ হাত স্টীয়ারিং-এ এবং ডান হাত জানলায় রেখে অরি বলল, কি পারো না?

পিকু বলল, বললামই তো! কিছুই পারি না। অন্ধকারে পথ দেখতে পারা সম্ভব নয়। আমি বাঘ নই। ভবিষ্যতে আমাকে কখনও সঙ্গে এনো না আর কিছু করতেও বোলো না।

অরি রীতিমত অপ্রতিভ হল। একটু দুঃখিতও। সন্ধ্যের অন্ধকারে ওর মুখ দেখা গেল না।

কিশা অরির পক্ষ টেনে বলল, ওর কথায় রাগ করবেন না অরিদা! ও ওরকমই অদ্ভুত!

অরি বলল, সরি পিকু। পার্ডন মী।

তারপরই কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, টুবুল ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি?

অনেকক্ষণ। কিশা বলল।

বেচারা! সারাদিন ধকল তো কম যায় নি। গরমও বেশ পড়ে গেছে। আমারই কষ্ট হচ্ছে; আর ওর!

পিকু আর কোনো কথা বলেনি। ওর দিকের জানালার কাঁচটা তুলে দিয়ে ফসস্‌স্‌ করে একটা সিগারেট ধরিয়েই আবার কাঁচটা নামিয়ে দিয়েছে। কিশা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, ঐ তো! সামনেই আলো জ্বলছে। আমরা কি বাংরিপোসি এসে গেলাম? অরিদা?

মনে হচ্ছে।

বিড় বিড় করে বলল অরি, তারপর গাড়ির গতি কমিয়ে পথের ডানদিকে চোখ রেখে চলতে লাগল।

কি দেখছেন ? ডানদিকে ? কিশা শুধোল।

বাংলোটা !

তারপরই বলল, এদেশে বোধহয় এই একটি মাত্র বাংলোর চৌকিদার মেয়ে। জানো কিশা ?

কিশা হৈ হৈ করে উঠল।

বলল, বলেন কি ? মেয়ে চৌকিদার ? জঙ্গলের ডাক বাংলোর ?

পিকু শ্লেষ-মেশানো গলায় বলল, তা নইলে আর অরিদা এই বাংলোর খোঁজ রাখবে কেন ?

কিশা পরিবেশটাকে লঘু করার জন্যে বলল, যার যে-রকম মন, যার যে-রকম রুচি, তার সে-রকম ভাবনা ! কি বলেন ? অরিদা ?

অরি কথা বলল না।

পিকুও কিশার কথার পিঠে আর কথা বলল না।

মিনিট কয়েক চলবার পর গাড়িটাকে ডান দিকের বাংলোর গেটে ঢুকিয়ে দিল অরি। বেশ গাছপালা আছে। কিশা দেখল।

কম্পাউন্ডের মধ্যের পথে কিছুটা গিয়ে গাড়িটাকে দু'কামরা বাংলোর সিঁড়ির সামনে রেখে অরি কিশাকে উদ্দেশ্য করে বলল, যাও, ভিতরটা দেখে এসো। যদি অপছন্দ হয়, তাহলে কিন্তু তিন হাজার ফিটেরও বেশী উঁচু বাংরিপোসির ঘাট পেরিয়ে বিসোইতে গিয়ে বাংলোর খোঁজ করতে হবে। বাংরিপোসির ঘাট আবার সিমলিপাল ন্যাশন্যাল পার্কের মধ্যে পড়ে। অটোমোবাইল এ্যাসোসিয়েশানের বইয়ে লেখা আছে, সেখানে সন্ধ্যের পর জংলি হাতীর খুব ভয়।

কিশা বলল, বাঃ কী দারুণ হবে। সন্ধ্যে তো হয়েই এল। চলুন চলুন তাই-ই যাই। সত্যিই দেখা যাবে নাকি জংলি হাতী ? চলুন অরিদা, এখানে থাকবো না আমি।

ততক্ষণে পিকু নেমে পড়েছে দরজা খুলে। দরজা বন্ধ করতে করতে বিড় বিড় করে বলছে, লুনাটিকস।

একজন রোগা মত অল্পবয়সী লোক প্যান্ট ও হাওয়াইন শার্ট পরে টর্চ হাতে পাশ থেকে এসে বারান্দায় উঠল। পিকু তাকে ঘর দেখতে বলল। ইতিমধ্যে দপ্ করে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠল বারান্দায় এবং ঘরে। এতক্ষণ লোড-শেডিং ছিল বোধহয়।

কিশা বলল, এ মাঃ ! সব মাটি হল ! এখানেও এই সুন্দর পরিবেশেও ইলেকট্রিসিটি !

পিকু ফিরে এল। বলল, নামো নামো কিশা। ফার্স্ট ক্লাশ বন্দোবস্ত ইলেকট্রিসিটি আছে, ডানলোপিলো আছে, বিরাট বাথরুম, বিরাট ড্রেসিং রুম ! দাও টুবুলকে আমার কাছে দাও।

বলেই একহাতে টুবুলকে, আর অন্য হাতে ওর ছোট ব্যাগটাকে পায়ের কাছ থেকে তুলে নিয়েই পিকু চলে গেল।

অরি হেসে বলল, পিকু বুঝি ডানলোপিলোর খুব ভক্ত ?

কিশা বলল, আর বলবেন না, সবকিছুরই ভক্ত, যা-কিছু আরামের।

কিশা নামতে যাচ্ছিল, এমন সময় অরি কি যেন বলতে গেল।

কিশা নেমে বলল, আপনি নামুন, স্ট্রেইন তো সবচেয়ে বেশী হল আপনারই—সেই সকাল থেকে গাড়ি চালাচ্ছেন।

বলেই, অরির দরজা খুলে ধরল।

অরি বলল, ওরে বাবারে। আজই মরব। এত আদর কী সইবে কপালে।

কিশা হাসল। বলল, আপনি পারেন, সত্যিই পারেন।

গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল অরি কোমরটা টান টান করে। পিকু গাড়ির দিকেই আসছিল বুট খুলে মালপত্র নিতে। ও ইতিমধ্যে নিজের পায়জামা পাঞ্জাবী তোয়ালে সাবান সব বের করে ফেলেছে। হাওয়ায়-ওড়া পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল ওরা।

কিশা একবার চকিতে অরির দিকে চেয়েই সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। ওর চুল এলোমেলো, শাড়ি ক্রাশড্, মুখ সারাদিনের রোদে আর অযত্নে ক্লান্ত—তবু কোনো অনুযোগ নেই, অভিযোগ নেই, যেন কত খুশী ও।

চলে-যাওয়া, লম্বা ছিপছিপে পিছন-ফেরা কিশার দিকে তাকিয়ে অরির বুকের মধ্যেটা যেন কেমন করে উঠল। কেউ যেন ছোরা বসাল তার বুকে—আবার কেউ যেন তা সঙ্গে সঙ্গে বুক থেকে উঠিয়েও নিয়ে, কী এক আশ্চর্য সুখানুভূতিতে তার সমস্ত বোধ ভরে দিল।

হাওয়াতে শুকনো পাতা উড়ছিল, গড়াচ্ছিল মচমচানি তুলে। বাংলোর ডানদিকে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ। অশ্বত্থ কি বট বোঝা যাচ্ছে না রাতে। ঝরা পাতায় নিচটাতে গালচের মত হয়ে গেছে। তার ঠিক সামনেই অনেকগুলো নিম গাছ।

কিশা অদৃশ্য হলে, ধরে-যাওয়া হাত-পা ছাড়াবার জন্যে বাংলোর পিছন অবধি হেঁটে গেলো অরি। চমৎকার চাঁদ উঠেছে। উঁচু পাহাড়টা যেন খাড়া উঠে গেছে বাংলোটার গা থেকেই—জঙ্গল বেড় দিয়েছে বাংলোকে পিছন দিকে। জঙ্গলের উপর উড়তে উড়তে একটা পেঁচা ডাকছে কিঁচি-কিঁচি-কিচর কিচি-কিচি-কিচির্।

সেই গ্রীষ্মে রাতের হু-হু হাওয়ায়, বাংলোর নির্জন নীরব প্রান্তরে দাঁড়িয়ে চাঁদ-ভেজা জঙ্গল, প্রান্তর আর পাহাড়ের দিকে চেয়ে অরির ভীষণ ভাল লাগল। অগুনতি তারা আর চাঁদে সমুজ্জ্বল নির্মেঘ আকাশ, এবং নিমফল, করৌঞ্জ ও দূরাগত মহুয়ার গন্ধে—মাতাল চুল এলোমেলো করা হাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞতায় তার মন নুয়ে এল। সেই কৃতজ্ঞতা কার প্রতি তাও সে জানে না। সে একজন আধুনিক মানুষ। ভগবানে বিশ্বাস নেই তার। ও ভাবছিল, বোঝবার চেষ্টা করছিল যে, এ কৃতজ্ঞতা তাহলে কার প্রতি ?

অরি বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে থামের উপর পা দুটো তুলে দিয়েছিল বারান্দার আলোটা নিবিয়ে। কিশাদের ঘর অন্ধকার। পিকু হয়ত চান করতে গেছে। কিশা রেস্ট করছে।

অরি উঠল। ঘরে গিয়ে সুটকেশ খুলে নিজের পায়জামা-পাঞ্জাবী বের করল। তারপর প্যাকেটটা নিয়ে ওদের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আসব ?

কে ? কিশা বলল ভিতর থেকে। বোধহয় শুয়ে ছিল।

আমি। অরি বলল।

আসুন, আসুন, বলে কিশা উঠে বসতে বসতে শাড়ি সামলে নিয়ে ডাকল অরিকে।

অরি বলল, এটা তোমার জন্যে এনেছিলাম।

কি ?

এক প্যাকেট সাবান। আর ধূপকাঠি।

কিশা লজ্জিত গলায় বলল, কি করেন না আপনি ! কি সাবান ? তারপরই বুকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকে বলল, ঈস্‌স্ কী দারুণ !

অরি আস্তে আস্তে বলল, মেখো, এখানে যে কদিন থাকো। বলেই, বাইরে চলে এলো।

বারান্দায় আরো কিছুক্ষণ বসে থাকল অরি। ভাবল, লোকে বলে নিউ মার্কেটে বাঘের দুধও পাওয়া যায় ' আর এ তো বিলিতী সাবানই মাত্র ! কিশা কি জানে যে, অরি কিশার জন্য সব কিছুই ' রতে পারে। কিশা যদি হাসিমুখে খুশি হয়ে নেয় তাহলে পুরো নিউ মার্কেটই কিনে আনতে পারে ও কিশার জন্যে। কিশা কি সেকথা বোঝে ?

বাইরের দরজাটা বন্ধ করে চান করতে গেল অরি। চান করতে করতে ও ভাবছিল, কিশাকে কি ও ভালোবেসে ফেলেছে ? আবারও কাউকে ভালোবাসা কি ওর পক্ষে সম্ভব ?

ভালো তো একদিন বেসেই ছিল, অনেক ভালোই বেসেছিল। কিন্তু সেই ভালোবাসার জন তো অরিকে ব্যবহার করেই ছুঁড়ে ফেলে দিল পথে। সেই মেয়ে, তার নিজের ঘর, তার স্বামী কন্যার ছোট্ট সংসার, তার স্বার্থ, তার ছোট ঘরের ছোট মনের ছোট সুখ নিয়েই খুশি আছে এখন। তার সময় নেই এক মুহূর্ত অরির জন্যে। অরিকে সে মাড়াই করা আখের মত ফেলে দিয়েছে, তার নরম ভালোবাসা, তার বিশ্বাস, তার সমর্পণ ; তার সব কিছুকে নিংড়ে নিয়ে। অরির চেয়েও প্রিয়তর অনেক নতুন নতুন মানুষ এসেছে এখন তার জীবনে। এসেছে, আছে। তারাই তাকে ঘিরে থাকে। অরি হেরে গেছে। কিংবা কে জানে ? হয়ত হেরে গেছে সে-ই। ভালোবাসার তাঁতে যে একবার তাঁত বুনেছে, সে কখনই জিততে পারে না। কোনোদিনও না।

অরি ভাবছিল, 'ওয়ান ইজ নোন বাই দ্যা কোম্পানি হি কীপস।' সেই মেয়ে, তার মানসিকতার সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছে সেই সব মানুষদেরই মধ্যে। খাদ্য পানীয়, রুজি-

রোজগার এবং হিহি-হাহা ছাড়া অন্য কিছু গভীরতর ব্যাপার তারা একেবারেই বোঝে না। অরি সেই মেয়েকে যে দুর্লভ সম্মানের আসনে বসিয়েছিল, সেই আসন থেকে নেমে এসে সে তার নিজের চারিত্রিক লক্ষণযুক্ত একদল মানুষী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জীবের সঙ্গে দল বেঁধেছে। রুমি বোধহয় আর দলছুট হবে না। জলের মতই সে তার চরিত্রের, সংস্কৃতির, শিক্ষার নিম্নমুখী প্রবণতার ঢালের উপর দিয়ে দ্রুত গড়িয়ে গিয়ে তার নিজের শ্রেণীর মানুষের ভীড়ে মিশে গেছে। অরি তাকে যে মানসিক উচ্চতা দান করেছিল, সেই দুর্লভ দানের মূল্য বা মর্যাদা সে কিছুমাত্রই বোঝেনি। সেটা তার দুর্ভাগ্য।

অরি অপমানে, অভিমানে দূরে সরে এসেছে ক্রমাগত। তাতে সেই মেয়ের কোনো ক্ষোভ বা দুঃখ হয়নি। সে বোধহয় এই-ই চেয়েছিল। অরির ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে তার জীবনে। একেবারেই শেষ হয়ে গেছে।

খুব ভেঙে পড়েছিল একসময় অরি। কিন্তু এখন বেশ হালকা বোধ করে। যে-সম্পর্কের ভিত নড়ে গেছে, যাতে আর আন্তরিকতা নেই, তাকে ছিন্ন করাই শ্রেয়। একরকমের মুক্তি তো।

কিশা একদিন গার্জেনের মত ধমক দিয়ে বলেছিল অরিকে, বিয়ে করুন না একটা। এখনও বিয়ে না করলে, কবে করবেন আর ?

অরি বলেছিল, কাউকে যে ভালোই লাগে না। আর যদি বা কাউকে ভালো লাগেই, তো দেখি তারা সবাই বিয়ে করে ফেলেছে।

তারা কারা ? কিশা চোখে চোখ রেখে শুধিয়েছিল।

অরি মুখ নামিয়ে বলেছিল, যেমন ধরো, তুমিই !

কিশা কথাটার গভীরতা বুঝেও, না-বোঝার ভান করে জোরে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, পারেন; সত্যিই পারেন আপনি।

অরি সেদিনও বলেছিল, আমি পারি না। মুখে আর কিছু ও বলেনি। কিন্তু মনে মনে বলেছিল, তোমাকে ভালো না-বেসে যে পারি না, তাই-ই ভালোবাসি। আমি জানি, আমার কপালে অনেক দুঃখ। তুমি আমাকে এড়িয়ে যাও, এড়িয়ে চলো। ফোন করলে, দুটো কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখো, একা থাকলে কোনো অছিলায় উঠে যাও সামনে থেকে।

তুমি কী ভাবো, আমি বুঝি না ? সবই বুঝি।

কিন্তু কেন অমন করো ? আমাকে দেখে কি মনে হয় যে, আমি কেড়ে নেওয়ার মানুষ ? ছোটবেলা থেকে বাড়ির চাকর ঠাকুরের কাছ থেকে পর্যন্ত নিজে চেয়ে কিছু খাইনি। আদর করার মানুষও সংসারে আমার আর কেউই নেই। কর্তব্য আছে, দিনে আঠারো ঘন্টা পরিশ্রম আছে, অসংখ্য মানুষের মুখ-ফুটে বলা এবং না-বলা প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব আছে। এই-ই, এই-ই সব।

তবু তুমি কাছে এলে, বড় ভালো লাগে। কাছে থাকলে, ভালো লাগায় মরে যাই।

তোমার চোখে চোখ রাখলে আমার জ্বালা-ধরা অনেক বোবা কান্নায় লবণাক্ত চোখ, বড় স্নিগ্ধতা পায়। আমার ভিতরে যে একটা ভিখারী, রুক্ষ, পিপাসার্ত আমি বাস করে, বাইরের সাফল্য, হাসি আর সপ্রতিভতার মোড়কের মধ্যে সে যে আছে, বোঝাই যায় না,একেবারে বোঝা যায় না যে, সে-ই আসল। সেই আমি তোমার সঙ্গ পেয়ে সবুজ হয়ে উঠি, সরস হয়ে উঠি। বর্ষার জল-পাওয়া লতার মত তখন প্রতি অণুতে অণুতে সঞ্জীবিত হয়ে উঠি আমি।

ভালো করে সাবান দিয়ে ঠাণ্ডা জলে চান করে শরীরের সঙ্গে মনটাও যেন চাঙ্গা হয়ে উঠল অরির।

তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে অরি বলল, এতদিন এত বছর তুমি কোথায় ছিলে কিশা ? আমাদের বাড়ি থেকে তোমাদের বাড়ি তো কত কাছে। কতদিন রাসবিহারী এ্যাভিন্যু দিয়ে হেঁটে গেছি। সকাল-সন্ধ্যাতে। কই, কখনও কেন তোমাকে দেখিনি ? এই কোলকাতাটা একটা অদ্ভুত জঙ্গল। পাশের বাড়ির ফুলের গন্ধ পাশের বাড়িতে পৌঁছয় না। বাজে, একেবারেই বাজে ব্যাপার। আমার কেবলই মনে হয় যে, তুমি আমারই জন্যে জন্মেছিলে। তোমার দুটি নরম ভাবালু চোখের স্বপ্নিল দৃষ্টি, তোমার ঠোঁটের তিল, তোমার নরম কালো মাথা ভরা চুল, তোমার হাঁটা, তোমার কথা বলা, তোমার মিষ্টি স্বভাব আমাকে কেবলই বারবার বলে যে, তুমিই আমার মানসী। তোমাকেই গোঁফ ওঠার দিন থেকে স্নিগ্ধ রাতের বিছানাতে, একা একা প্রথম দোকা হবার স্বপ্নে, আমি যেন তোমাকেই শুধু খুঁজেছি। শুধু তোমাকেই।

কোথায় ছিলে কিশা ?

এলেই যদি, তো এতদিন পরে এলে এত পথ পেরিয়ে ? বিবাহিত হয়ে সন্তানের জননী হয়ে, এত বছর পরে কেন এলে তুমি আমার সামনে ? আমার এ-কূলও গেল, ও-কূলও গেল। তোমাকে দেখার পর, কাছ থেকে জানার পর, বিয়ে তো আর কাউকেই করা হবে না।

বিয়ে মানে কি দুটি শরীরের নৈকট্যই ? এক খাটে একজন পুরুষ আর একজন নারীর সহবাস ? ছেলে বা মেয়ের বাবা কী মা হওয়াই কি বিবাহিত জীবনের পরম গন্তব্য ? এই ভুলে থাকা, এই ভুলে যাওয়া, এই চোখে ঠুলি-পরানো জ্যান্ত ও জান্তব পুতুল খেলা ? ব্যস্‌স্ এই-ই সব ? নিজের আমিত্বকে, নিজের ব্যক্তিসত্তাকে, নিজের স্বাতন্ত্র্যকে এমন করে মাটি চাপা দিয়ে সেই কবরের উপর দাম্পত্য জীবনের ফুল ফোটানোর চেষ্টার মধ্যেই কি বিয়ের সবটুকু সার্থকতা ?

এসব ভাবতে পারে না বেশীক্ষণ, ভালো লাগে না অরির। তার চেয়ে কিশাকে আবার কখন একটু দেখতে পাবে সেই কথাই ভাবা ভালো।

পিকু বারান্দায় আলো জ্বালিয়ে বসেছিল। কিশা টুবুলের ঘুম ভাঙিয়ে বাথরুমে নিয়ে গেছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাতে।

সিগারেট ধরিয়ে পিকু বলল, রাতে খাওয়া দাওয়ার কি হবে ?

কি খাবে বলো ?

এমন করে বলছ, যেন ফাইভ স্টার হোটেলে এনে তুলেছো। চয়েস কি আছে কিছু ?

অল্পবয়সী ছেলেটিকে ডাকল অরি। তারপর বলল, মুরগী পাওয়া যাবে ? টিব্বা সিং ?

রাত হয়ে গেলো ! ও বলল।

দেখো না, যদি পাও। বলে, অরি পার্স বের করল। বলল, মাউসিকে বোলো যে, গতবারের মত মুরগীর ঝোল, আলুভাজা, ডাল ভাত করতে।

ছেলেটি হাসল। অরি তিরিশটা টাকা দিল ওর হাতে।

পিকু বলল, তুমি তো পেট্রোলও কিনতে দিলে না একবারও। খাওয়ার টাকাটা না হয় আমিই দিই।

ছেলেটি টাকা নিয়ে চলে গেল।

অরি বলল, থাক না, তার চেয়ে তোমরা একবার আমাকে সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে এসো। সেবারে আমি পার্স রেখে আসবো কোলকাতায় !

পিকু বলল, ওক্কে। ইটস্ আ ডিল্।

অরির মনে পড়ল, রুমিও বলেছিল, অরিদা। আপনাকে একবার বেড়াতে নিয়ে যাবো আমি। যাবেন তো ?

নিশ্চয়ই ! যাবো না ? অরি বলেছিলো।

কিন্তু অরি জানে যে, সে কখনও নিয়ে যাবে না আর অরিকে। অরিকে কনভিনিয়েন্টলি ভুলে গেছে সে।

একসময় কত বেড়িয়েছে, কত মজা করেছে, কত কি উপহার দিয়েছে অরি তাকে। তার আপদে বিপদে, প্রয়োজনে দৌড়ে গেছে সবচেয়ে আগে। টাকা দিয়েছে প্রয়োজনে। অপ্রয়োজনেও। অনেকবার সেই টাকা ফেরৎ দিয়ে দেবার হুমকিও দিয়েছে সেই মেয়ে সাম্প্রতিক অতীতে।

টাকা তো ফেরৎ হয়ই। কিন্তু যে সময়ে যা দেওয়া যায়; সেই সময়ের মূল্য কি শোধা যায় কখনও কাউকে ?

আর ভালোবাসা ?

টাকা তো কতগুলো কাগজই। টাকার সঙ্গে সেদিন যা মাখামাখি হয়েছিল তা সেই মেয়ে কখনও শুধতে পারবে না, শুধবেও না। রুমি বড়ই বোকা। অথবা বড় ধূর্ত। হয়

অরির হৃদয়ের উষ্ণতা বোঝার মত বুদ্ধি তার ছিলো না, নয় সে টাকাই চেয়েছিল শুধু অরির কাছ থেকে। অরিকে কখনও চায়নি।

এসব ভাবলে মনে বড়ই কষ্ট হয়। না, নাঃ, রুমি কি এত ছোট! এত ছোটমনের একজন মানুষকে কি অরি ভুল করেও ভালোবাসতে পারতো কখনও? থাক। "যে দিন গিয়েছে চলে সে আর ফিরিবে না, তবে ও গান আর গাসনে।" থাক এসব পুরোনো কথা, ঝরে যাক এই শেষ বসন্তের হাওয়ালাগা রাশ রাশ পাতার মত মনের গাছ থেকে। এই নীচতা বা নীচতার ভাবনার চেয়ে রিক্ততা অনেক ভালো।

রিক্ততাতে কোনো শঠতা নেই।

টুবুল গা-মুখ পুছে স্লিপিং স্যুট পরে, পায়ে ক্ষুদে চটি গলিয়ে এল বাইরে।

পিকু বলল, মা কি করছে?

চান করছে। অরি বলল, আমার কাছে এসো। বাঃ, তোমার চটিটা কি সুন্দর।

এতা তটি না। এ্যাপ-থু।

কি বললে?

অরি জিজ্ঞেস করল।

পিকু উত্তর দিলো, স্ট্র্যাপ-শু।

টুবুল বলল, হ্যাঁ, এ্যাপ থু।

ওঃ। অরি বলল।

তারপর বলল, দাঁড়াও টুবুল। তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি।

তি জিনিত?

দেখতেই পাবে। বলে, উঠে গিয়ে ক্যাডব্যারির মিল্ক চকোলেট নিয়ে এল ও হাতে করে ভিতর থেকে।

টুবুল বলল, ক্যাদব্যারি? খাবো না। মা বকবে।

খাওনা। আমি দিলে মা কিছু বলবে না।

দাদু দিলেও বকে। তুমি তি দাদুর তেয়ে বদো?

অরি লজ্জা পেলো। জুলপির কাছে এবং কপালের দুপাশে তার চুলে রুপোলি রেখা লেগেছে স্পষ্ট হয়ে। তার গায়ের উজ্জ্বল কালো রঙ কেমন খস্‌খসে শ্রীহীন দেখায় আজকাল। এই বড় গাছটির মত তারও পাতা ঝরা শুরু হয়েছে। তবে ঐ গাছে পাতা আসবে আবার, নতুন সব কচি পাতা। কিন্তু...

টুবুল কি তাকে তার দাদুর চেয়েও বড়ো ভাবছে। টুবুলের মাও তা ভাবতে পারে। মনের কষ্টটা মনে চেপে, অরি বলল, খাওনা খেয়ে নাও। রান্না হতে অনেক দেরী এখনও। সবে মুরগী আনতে গেছে।

মুলগী ? কি লঙের ?

কি করে জানব বাবা ? অরি বলল।

টুবুলকে বাবা বলে ডেকেই একটা ধাক্কা খেল। যদি কিশা তার স্ত্রী হত,পারত ; তবে টুবুল তারও হতে পারত। এবং হলে, সে টুবুলকে বাবাই বলত। কিন্তু কত তফাৎ। বাবা ডাকটার মধ্যেই যেন কেমন একটা বুক ভরা না আত্মত্যাগের ব্যাপার আছে। বাবা না হয়েও, কোনোদিনও হবে না জেনেও ; অরি বুঝতে পারল। অস্বস্তি লাগতে লাগল ওর।

পিকু বলল, তোমার মাউসী না কে তাকে একটু জল দিয়ে যেতে বলো তো জাগে করে। একটু হুইস্কি খাই। আজকাল আর এত ধকল সহ্য হয় না।

অরি, মাউসী বলে ডাকল। চৌকিদার মরে গেছে। তার স্ত্রীই এখন চৌকিদার। ওড়িয়াতে মাউসী মানে, মাসীমা। মাউসী এসে বলল, ভালো আছো বাবু ?

অরি বলল, তুমি ভালো ? খুব ভালো করে রাঁধবে। এঁরা আমার অতিথি।

যতটুকু ভালো আমার দ্বারা হয়, করব। বলল মাউসী।

অরি বলল, একটা জাগে করে জল আর একটা গ্লাস পাঠিয়ে দাও।

পিকু বলল, একটা কেন ? তোমারও খেতে হবে।

অরি বলল, আমার ইচ্ছে করছে না।

পিকু বলল, ইচ্ছা না করলে হবে না। ইচ্ছা করতে হবে। এক যাত্রায় পৃথক ফল ঠিক নয়।

তারপর বলল, আমি হুইস্কিটা নিয়ে আসি।

অরি বলল, তোমার জন্যে আমি যে নিয়ে এসেছি।

কি ?

স্কচ্।

বলো কি ? তোমার ব্যাপারই আলাদা। যা ট্যাক্সের গুঁতো, চাকরি করে তো আর কখনও এদেশে স্কচ্ খেতে পারবো না। একটা সাইড লাইন আরম্ভ করা দরকার। ছোটখাটো বিজনেস টিজনেস। তেলে ভাজার দোকান দিলেও মন্দ হয় না ! আসল কথা হচ্ছে, টাকা চাই, আরও টাকা ! টাকা না হলে জীবন বেকার।

অরি উঠে ঘর থেকে হুইস্কি আনতে গেল। ভাবল, টাকা তো অরি অনেকই উপায় করে। অরির টাকা আছে, কিন্তু কিশা পিকুর। পিকু জীবনে কি পেয়েছে তা জানে না বলেই অন্য অনেক কিছুর উপরে ওর এত আকর্ষণ। সব আপেক্ষিকতা দাঁড়িপাল্লাতে বসালেও কিশার দিক ভারী হবেই। সোনা দিয়ে ওজন করলেও কিশার দাম হয় না। পিকুটা কী বোকা ! অরি নিজেও বোকা ! রুমিও বোকা। সকলেই বোধহয় বোকা ; কে যে কী পেয়েছে জীবনে, আর কে যে কী চায়, তা কেউই জানে না। যা পেয়েছে, তার দাম নেই কানাকড়ি কারো কাছেই। আর যা পায়নি, তার জন্যেই কাঙালপনা।

অরি তার সব যশ, সব অর্থ, সব স্বাচ্ছন্দ্য পিকুকে দিতে রাজী আছে। বদলে পিকু কিশাকে দিয়ে দেবে তাকে ? দেবে না। অরি জানে যে, কিশাকে দেবে না পিকু। আর যদি বা দেয়ও সে, অন্য জিনিসের বদলে, কোনো জড় জিনিসেরই মত, বদলে; তবু কিশা কি আসবে ? কিশা তো একজন আলাদা মানুষ। দাবার গুটি তো সে নয়। একজন মানুষ তো নিজেই শুধু নিজেকে দিতে পারে।

কিশা কখনই দেবে না নিজেকে। অরি ভাল করেই জানে।

বারান্দাতে ফিরে যেতেই পিকু চিৎকার করে দাঁড়িয়ে উঠল। করেছো কি ? কালো কুকুর ! হাউ গ্রেট ! অরিদা।

অরিও হাসল। বলল, তুমি এসব ভালোবাসো। তাই...

টুবুল বারান্দার ধারে গিয়ে এদিক ওদিক দেখে বলল, কোতায় বাবা ? বাবা কালো কুকুত কোতায় ? ঐ কুকুতটা তো লাল।

একটা মেটে-রঙা মেয়ে কুকুর কুন্ডলী পাকিয়ে সিঁড়ির পাশে শুয়ে ছিল। চেঁচামেচিতে ভয় পেয়ে উঠে পালাল।

পিকু হাসল। অরিও।

পিকু ব্ল্যাক ডগ্ হুইস্কির বোতলটাকে, যেন সত্যিই সেটা একটা ছোট্ট কাড্‌লি কালো পুড্‌ল, এমনভাবে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরল।

মাউসী গ্লাস আর জল নিয়ে এল। ঘর থেকে ছোট টেবল এনে তার উপরে রাখল।

পিকু বলল, আরও একটা গ্লাস মাইসী।

অরি বলল, মাইসী নয় মাউসী।

চৌকিদার চলে যেতেই পিকু বলল, চেহারাটাও মাউসী মাউসী !

মানে ? অরি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

মানে, ইঁদুর ইঁদুর ! শাড়িটা কতদিন কাচে না বলো তো ? গা দিয়ে ইঁদুরের গন্ধ বেরুচ্ছে। বলেই, নাক টেনে বড় নিশ্বাস নিয়ে বলল, আহ্...

পরদা ঠেলে কিশা দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়। কিশার গায়েমাখা সাবানের গন্ধে বারান্দাটা ভরে গেল।

পিকু বলল, এ কিসের গন্ধ ? এ তো আমার স্ত্রীর গায়ের গন্ধ নয় ?

কিশা বলল, এত অসভ্য !

তারপরই বলল, সাবানেরই গন্ধ। অরিদা দিয়েছে।

অরি অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল। কিশার গায়ের গন্ধটা যে কেমন তা পিকুই জানে। অরি কখনও জানবে না। কিন্তু অরি জানে যে, এই সাবানের গন্ধের চেয়েও তা সুন্দর। কারণ তা কল্পনার গন্ধ।

মন খারাপ হয়ে গেল অরির।

এই আলোটা আবার জ্বালালো কে ? নিশ্চয়ই তুমি।

বলেই, পিকুর দিকে তাকাল কিশা !

বলল, বাইরে এমন সুন্দর জ্যোৎস্না ! তোমার মত আন্‌রোম্যান্টিক লোক দেখিনি।

অরি বলল, দাঁড়াও, এক্ষুনি নিভিও না, তোমাকে একটু ভালো করে দেখি।

কিশা লজ্জা পেল ! খুশিও হলো।

পিকু বলল, খোলা বারান্দায় আলো জ্বালিয়ে কোনো মেয়েছেলেকে দেখা তোমার মত আনপড়্ ব্যাচেলরের পক্ষেই শোভা পায় অরিদা।

কিশা সংক্ষিপ্ত ধমক দিলো পিকুকে। বলল, ওরকম ভাষা ব্যবহার কোরো না তো। মেয়েছেলে কি ? মেয়েছেলে ?

পিকু ধমক খেয়ে বলল, আহাঃ আমি কি বাজারের মেয়েছেলের কথা বলছি।

অরি বলল, পিকু ! উ্য আর ইনকরিজিবল।

পিকু গ্লাস ভর্তা খুলতে খুলতে বলল, এমন দারুণ হুইস্কিটার ইজ্জৎ নষ্ট করে দিলে চেঁচামেচি করো। নাও অরিদা ! কি দেখবে দ্যাখো ! তারপর কিশাকে বলল, অরিদার দেখা হলেও, আলোটা নিবিয়ে দিও না যেন। আগে হুইস্কিটা ঢালি গ্লাসে। কালো কুকুকের নূপ দেখি !

তারপর অরির গ্লাসে ঢালা শুরু করে অরির দিকে ফিরে বলল, টেল মী, হোয়েন টু স্টপ্।

অরি চেঁচিয়ে উঠল, ব্যাস্ ব্যাস্।

পিকু বিরক্তির গলায় বলল, উইন্‌কারনিস খেলেই পারো, কি ফসফোলেসিথিন। কিংবা দ্রাক্ষারিষ্ট ? হুইস্কি খাওয়া কেন ?

আলোটা নিবিয়ে দিল কিশা। তারপর অরির পাশের চেয়ারটাতে এসে বসল।

অরির সমস্ত সত্তাতে সুস্নাতা, সুগন্ধী, সুন্দরী কিশার সান্নিধ্য লক্ষ লক্ষ হাসনুহানা ফুল ফুটিয়ে দিল।

প্রথম অন্ধকারে চোখে কিছুক্ষণ পরিষ্কার দেখা গেল না। তারপর ধীরে ধীরে সব পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল।

বাইরে ফুট্ ফুট্ করছে জ্যোৎস্না। শুকনো পাতা গড়িয়ে গিয়ে হাওয়া বইছে। গ্রামের মধ্যে কারা যেন মাদল বাজাচ্ছে।

বাইরে চেয়ে চুপ করে রইল কিশা। টুবুল বলল, মা আমি মানা কলেতিলাম।

ও কি ? কি খাচ্ছো তুমি ? দেখি কাছে এসো।

পিকু বলল, ক্যাড্‌ব্যারি। অরিদা দিয়েছে।

কিশা বলল, সবটা একা খেওনা, আমাকে একটু দাও।

অরি বলল, তুমি খাবে ? দাঁড়াও নিয়ে আসছি।

বলেই, কিশার মতামতের অপেক্ষা না করেই ঘরে গেল। একটা ক্যাড্‌ব্যারি এনে দিল ওকে।

কিশা কাগজের ও রাংতার মোড়ক খুলে আধখানা ভেঙ্গে বলল, এই নিন।

অরি হাত বাড়াল। অন্ধকারে আঙ্গুলে আঙ্গুলে ছোঁয়াছুয়ি হল। গা শির শির করে উঠল অরির।

ও কোনোদিনও বড় হবে না। চিতাতে ওঠার মুহূর্তে পর্যন্ত ও এমনি রোম্যান্টিক এবং বোকাই থাকবে। চিতার আগুনেই বুঝি ওর সব রোম্যান্টিসিজম্, সব মূর্খামি, দাউ দাউ করে জ্বলে যাবে। তার আগের মুহূর্ত অবধি নিজেই জ্বলবে নিজের মধ্যে। বারবারই ও ভুল বয়সে, ভুল লোককে, ভুল করে ভালোবেসে এল। মৃত্যু ছাড়া ওর শান্তি নেই, নিবৃত্তি নেই।

পিকু তুমিও একটু নাও। কিশা বলল, এক টুকরো চকোলেট এগিয়ে দিয়ে।

পিকু বলল, আমার গুরুচণ্ডালী দোষ নেই। ব্ল্যাক ডগ্-এর সঙ্গে ক্যাড্‌ব্যারি ! ইমপসিবল্। তারপরই বলল, একটু ভাজাভুজি করে দিতে বলো না অরিদা, তোমার মাউসীকে।

কিশা বলল, তুমি বড় ইন্‌কনসিডারেট। অরিদা এতখানি গাড়ি চালিয়ে এল। তুমি নিজে যাওনা।

বলে, নিজেই উঠে পড়ল বিরক্ত হয়ে।

পিছন পিছন টুবুলও গেল।

অরি বলল, গরম পড়েছে, সাপ-কোপের ভয় আছে, টর্চটা সঙ্গে নিয়ে যাও। বলে, টর্চটা এনে দিল ঘর থেকে।

পাশেই মাউসীর ঘর। সেই ছেলেটি একটি বড় শাদা মুরগী এনে পা ছড়িয়ে কাটতে বসেছিল। টুবুল দেখে কেঁদে ফেলল।

কিশা বলল, কাঁদে না টুবুল। সব পাখি পোষে না। কাঁদতে নেই। সব পোষও মানে না। যদিও মুরগী পোষ মানে।

টুবুল বলল, কি তুন্দর খাদা মুরগীতা !

মাউসী ওদের আদর করে বসাল তার ঘরের বারান্দাতে।

কিশা বলল, একটু আলুভাজা-টাজা করে দিতে পারো ঝাল ঝাল করে ?

চড়িয়েছি। এক্ষুনি হয়ে যাবে, মাউসী বলল। তারপরই বলল, তুমি কি বাবুর বৌ ?

কিশা লজ্জা পেল। ওর মুখ লাল হয়ে গেলো।

বলল, না। আমি...। বলেই, থেমে গেলো।

মাউসী বলল, বাবুটা খুব ভালো। কয়েকমাস আগে আরেকজন বাবুর সঙ্গে এসেছিল একদিন। আমার রান্না কত ভালো বলল। আমার ছোট্ট মেয়েকে জামা কেনার টাকা দিল। আমাকে আর টিব্বাকে মোটা বকশিস্ দিল।

টাকা থাকলেই মানুষ ভালো হয়। ভাবল কিশা। কিন্তু অরিদা কি শুধু টাকার কারণেই ভালো? টাকা থাকলেই কী সবাই ভালো হয়?

তোমাকে কি আগে চিনতেন বাবু? কিশা উৎসুক চোখে শুধোলো।

নাঃ। সেই তো প্রথম বার এলো। চিনবে কি করে?

ওঃ। বলল কিশা। মাউসীকে মিছিমিছিই বলা। খুব বেশী বয়স না। যৌবনের আলো এখনও দিগন্তে আছে, নরম হয়ে। বেশ মিষ্টি চেহারা। শরীরের বাঁধন ভালো।

কিশা একদৃষ্টে চেয়ে থাকল ওর দিকে। কি যেন ভাবছিল কিশা।

মাউসী বলল, কিছু বলবে তুমি?

নাঃ। আমি বলছিলাম, এখানে যারা আসে তাদের সকলকেই কি তুমিই রান্না করে দাও?

না, না। আমি মেয়েমানুষ, অচেনা-অজানা হুট করে এসে পড়া মানুষদের সামনে বেরোই-ই না। ঐ টিব্বাই সব কাজ কর্ম করে। কত রকম বাবু আসে। তাদের সামনে কি বেরোনো যায়? সেবার বাবু আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বিশেষ করে রাঁধতে বলল বলেই রান্না করে দিয়েছিলাম। নইলে টিব্বা হোটেল থেকেই খাবার নিয়ে আসত।

তারপর বলল, যে আলুভাজা করছি, শুকনো লংকা দিয়ে, তা খেয়ে বাবু আমাকে ডেকে বলল, মাউসী, অনেকদিন এমন স্বাদের আলুভাজা খাইনি। আমার মা নেই। মা থাকতে এইরকম করে ভাজতেন।

বলেই বলল, লোকটাকে বোধহয় আদর করার কেউ নেই। বৌকে আনে না কেন বাবু?

কিশা বলল, বাবুর বৌ নেই।

মরে গেছে? মাউসী সরলভাবে শুধোলো।

কিশার ভালো লাগছিল না। কেটে বলল, না। বিয়েই হয়নি।

তোমাদের বাঙালী মেয়েগুলো কেমন গো? এমন বাবুকে বিয়ে করল না কেউ? কেন? কালো বলে?

মাউসী অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলল।

কিশা বলল, জানি না। তারপর উঠে পড়ে সংক্ষিপ্ত রূঢ় গলায় বলল, আলুভাজাটা হয়ে গেলেই ওকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও। আমাকে চা খাওয়াতে পারো একটু?

চা ? চা তো নেই মা !

চা নেই ? অবাক হল কিশা।

এখানে তো কোনো কিছুরই বন্দোবস্ত নেই। মাউসী বলল।

ওঃ। বলে কিশা ফিরে এল টর্চ জ্বেলে পথ দেখে।

ফিরে আসতেই অরি বলল, চা খাবে কিশা ?

কিশা অবাক হল। মানুষটা কি মন পড়তে জানে ?

বলল, চা তো নেই।

হোটেল আছে। আমি নিয়ে আসছি। যদিও বেশ বাজে চা।

নাঃ না, আপনার যেতে হবে না।

কেন ? কাছেই তো। গাড়িতে যাব আর আসব।

তবে আমিও যাব আপনার সঙ্গে।

সে তো আমার সৌভাগ্য !

চলো, বলে গাড়ি খুলল অরি।

টুবুল বলল, আমি দাব।

কিশা বলল, না ! তুমি বাবার কাছে থাকো।

পিকু আরেকবার হুইস্কি ঢালল গ্লাসে।

বাজারটা কাছেই। অল্প কটি দোকান। এই রাস্তার সমান্তরালে আর একটা রাস্তা চলে গেছে—পৌঁছেচে গিয়ে বাংরিপোসি গ্রামে। এই রাস্তাটা গ্রামকে বাইপাস্ করে বেরিয়ে গেছে।

বাংলোর হাতা থেকে বেরিয়ে, পথে পড়েই অরি বলল, ভালো লাগছে তোমার ? এখানে এসে.? পথে গরম লেগেছে বেশী ?

ভাল লাগছে। খু-উ-উব। কোলকাতার ডিজেলের ধোঁয়া, লোডশেডিং, ভীড়, লোকজন, আওয়াজ, আমার দমবন্ধ লাগে। একমুহূর্তও ভালো লাগে না। কী ভালো যে লাগছে তা কী বলব।

ভালো। আমার চাকরিটা তাহলে আছে।

কিশা নিঃশব্দে হাসল।

চায়ের দোকানের সামনে অরি থামল।

একটি ছেলে দৌড়ে এল দোকান থেকে। একটা বড় হ্যাজাক জ্বলছে। উড়াল পোকার ভীড় তার সামনে। ভালো করে স্পেশ্যাল চা করতে বলল অরি ছেলেটিকে। কালকের জন্যে চা, কনডেনসড্ মিল্ক, বিস্কুট এই সবও কিনে নিতে হবে। ভাবল ও।

কিশার দিকে ফিরে বলল, কিছু খাবে ? গরম গরম ফুলরি ভাজছে।

খাবো ! কিশা চোখ নাচিয়ে বলল। ঝাল দেবে বেশী করে ?

তারপর বলল, ওকে বলবেন না। কেটে ফেলবে আমাকে। ও এরকম শ্যাবী, নোংরা জায়গায় খাওয়া দাওয়া পছন্দ করে না।

এসেছো শ্যাবী লোকের সঙ্গে। না হয় খেলেই। অরি বলল।

খাচ্ছিই তো! কিশা বলল।

কিশাও গাড়ি থেকে নামল। দু'পাশের দোকান থেকে লোকে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল। তারপর হেঁটে, অরি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেদিকে এগিয়ে গেল। ওর চলার ধরনটা ভারি সুন্দর। সব সুন্দর ওর। দেখা, না-দেখা সব কিছু।

অরি বলল, কী সুন্দর শাড়ির পাড়টা, খোলটাও দারুণ। খুব ভালো দেখাচ্ছে। তুমি অবশ্য যা পরো তাতেই ভালো দেখি আমি। আসলে তুমি এতই সুন্দরী যে, শাড়ীই সৌন্দর্য পায় তোমার কাছ থেকে।

থাক থাক আর না। অনেক তো হয়েছে। আর কেন? কিশা বলল।

অরি বলল, কি করব? আমি যে পারি না, না বলে পারি না, তাই-ই বার বার বলি।

চা ও ফুলুরি খেয়ে কিশা গাড়িতে উঠল। অরি বলল, নিয়ে যাবো নাকি একটু ফুলুরি। পিকুর জন্যে?

না, না অরিদা। ও এসব খায় না। তাছাড়া টুবুল চাইবে। পথের জিনিস। টুবুলের খাওয়া ঠিক নয়।

গাড়িটা যখন বাংলোর গেটের কাছে এল, তখন হঠাৎ কিশা বলল, আপনি বলেছিলেন বাংরিপোসির ঘাটটা সামনেই। চলুন না, যদি হাতী দেখা যায়?

পাগলী। বলল অরি।

তারপর বলল, রাতে যাওয়া ঠিক নয় মিছিমিছি। তবে কিছুটা উঠেই একটা ভিউ পয়েন্ট আছে, সেই অবধি যেতে পারো।

ওঃ! দারুণ দেখাবে—নিচের চাঁদ-ভাসা উপত্যকা, না? চলুন চলুন।

পিকুকে বলে যাবে না? আমাদের যেতে আসতে আর আধঘন্টা লাগবে কম করে।

কি আবার বলব। আপনার সঙ্গেই তো যাচ্ছি! রান্না হতেও এখনও একঘন্টা দেরী।

অরি গাড়ির গতি বাড়িয়ে ঘাটের দিকে চলল। ঘাটটা বাংলোর একেবারে সামনে থেকেই শুরু হয়েছে। পরপর কতগুলো ইউ-টার্ন। একটা বাঁকে কিশার হাত লাগল অরির বাঁ হাতে। বুকের রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে উঠল অরির।

কিশা বলে উঠল, কী দারুণ। কাল আমরা এই পথেই যাবো? নিজেদের একটা গাড়ি থাকলে কী মজা হত। ও কোম্পানী থেকে গাড়ি পাবে। কিন্তু কবে পাবে, ওই-ই জানে। তখন খুউব বেরোব। আপনি সঙ্গে যাবেন কিন্তু! আপনাকেও নিয়ে আসব প্রত্যেকবার আমাদের সঙ্গে। আপনি না থাকলে মজাই হবে না। ও বড় সাবধানী, বড় বাছবিচার ওর। আসবেন তো আপনি আমাদের সঙ্গে—আমার অতিথি হয়ে? কি অরিদা?

অরি কিছু বলতে যাচ্ছিল। সামলে নিল।

রুমিও ঠিক এমনি করেই বলত; বলেছিল, অনেক আদরে, অনেক ভালোবেসে।

অরি মনে মনে বলল, কিশা! অমন করে বোলো না! তুমি, তোমরা সকলেই মিথ্যেবাদী। কথা বলতে তোমরা ভালোবাসো, বড় সুন্দর সব আশার কথা বলো তোমরা, কিন্তু কোনো কথাই রাখো না। তোমরা কেউ-ই!

কিন্তু মুখে কিছুই বলল না।

গাড়িটা বেশ গরম হয়ে গেছে। এঞ্জিনের উপর ধকল পড়েছে। তবু কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা সেই জায়গাতে এসে পৌঁছল। গাড়িটা ডানদিকে সরিয়ে দাঁড় করাল অরি।

বলল, নামো।

হাতী আসবে না তো! ঠাট্টার গলায় কিশা বলল।

বলা যায় না। অরিও ঠাট্টার গলায় বলল।

আঃ অরিদা। আপনাকে কি যে প্রাইজ দেবো! কী ঠান্ডা এখানে। অনেক উঁচু, না?

তারপর ভিউ পয়েন্টে পৌঁছেই ভালোলাগায় স্তব্ধ হয়ে গেল কিশা।

এখন নীচের চন্দ্রালোকিত উপত্যকাকে প্রথম যৌবনের কোনো অপরিস্ফুট স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। কাছেই কোথা থেকে পিউ-কাঁহা পাখি আর কোকিল ডাকছে থেকে থেকে। পিউকাঁহা পিউকাঁহা পিউকাঁহা! আর কুহু কুহু কুহুতে সরগরম হয়ে রয়েছে জায়গাটা।

ওরা কেউই কোনো কথা বলল না। দুজনে দুজনের সান্নিধ্যে, এই বাঙ্ময় মোহময়ী রাতের দুধলী বালাপোষে জড়াজড়ি করে, কিন্তু ছাড়াছাড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পরে অরি বলল, এ্যাই শোনো; কাছে এসো!

কি? কিশা কাছে সরে এল।

অরি বলল, প্রাইজ দেবে বললে না? দেবে?

দেবো, আপনি যা চান।

যাই-ই চাই?

হ্যাঁ। যাই-ই চান।

অরি বলল, তবে আরও কাছে এসো।

কেন? না, না। থাক না অরিদা। কী সুন্দর রাত, দেখুন, চেয়ে দেখুন।

মেয়েদের জন্মগত সংস্কারে কিশা অরির সেই আহ্বানের তাৎপর্য বুঝেও স্বীকার করতে চাইল না। কিন্তু ভয়ও পেল না। নারী হিসেবে কিশা বুঝেছে এতদিনে যে, অরি এমন জাতের পুরুষ যে, তাদের নিয়ে ভয় নেই কোনো। ভয় এইটুকুই যে তারা বড় বেশী এমোশানাল। তাকে সুখী করতে গিয়ে পাছে কিশা তার কাছে দুঃখেরই বাহক হয়ে ওঠে, ভয় এইটুকুই।

অরি বলল, কথা শোনো, এসো।

কিশা আর কথা না বলে সোজা এগিয়ে এলো অরির কাছে। মুখ তুলে বলল, এই তো! আমি এসেছি।

কিশা রাণীর মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইল অরির সামনে।

আমি এসেছি, এসেছি।

এই 'এসেছি' কথাটা অরির সারা শরীরে শিহর তুলল। একজন নারী যখন একজন পুরুষে আসে, তখন এমনই শিহর লাগে বুঝি!

অরি আর কথা না বলে তার দু'হাতে কিশার মুখটিকে বড় আদরে বড় যত্নে ধরে ওর দুটি চোখে পর পর চুমু খেল, আলতো করে, ওর রুক্ষ ঠোঁট দুটিকে মনে মনে খরগোশের বুকের মত নরম করে নিয়ে।

কিশার হাঁটু দুটো এক অনামা শিহরণে থরথর করে কাঁপছিল। কিন্তু তবু কিশা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভালো লাগায় এবং অস্বস্তিতে ওর দু'চোখ বুঁজে এল।

অরি ওর মুখ থেকে দু হাত সরালে কিশা বলল, আপনি খুশী?

খুশী! বলল অরি।

কিশা বলল, আপনি বড় কথা বলেন। কিছু কিছু সময় থাকে, যখন একেবারে কথা বলতে নেই। তেমন সময় যে বেশী আসে না জীবনে।

দুজনেই চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

চলুন ওঘরে। কিশা হঠাৎ বলল।

কিশার বিয়ে হয়েছে পাঁচবছর। বিয়ের আগে ওকে একজন মাত্র চুমু খেয়েছিল একবার। সে বড় ছেলেমানুষী, অধৈর্য, তাড়াহুড়োর চুমু। তাতে এই গভীরতা ছিল না। কোনো কিছু যে এমন ধীরে সুস্থে, এমন তারিয়ে তারিয়ে, সমস্ত প্রকৃতির রূপ রস বর্ণ গন্ধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উপভোগ করা যায় এ অভিজ্ঞতা আগে একেবারেই ছিল না কিশার।

বিয়ের পর পিকুর কাছে অনেক আদর খেয়েছে সে। সব স্ত্রীই সব স্বামীর কাছে খায়। কিন্তু পিকুর কাছে কিশার শরীরটা একটা ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যাপার মাত্র। তাকে এমন মহামূল্যে, ভেলভেট-এর ওয়াড় খুলে দামী তারের বাজনার মত প্রকাশ করে এমন দরদী হাতে, চাঁদের আলোয়, ফুলের গন্ধের মধ্যে কখনও বাজায়নি পিকু।

অরির হাতের ছোঁয়া লাগতেই ও যেমন থরথর করে কেঁপে উঠেছিলো ভালো লাগায়, তেমন কখনও হয় না আজকাল পিকুর সঙ্গে। বিয়ের পর পর কি হয়েছিল তা চেষ্টা করেও মনে করতে পারে না আর। দাম্পত্য জীবনটা এখন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে।

এখন কিশার একমাত্র আনন্দ টুবুল। ওই-ই সব।

ও কি অন্যায় করল? ও কি অপবিত্র হয়ে গেল? ও যে পিকুর স্ত্রী। টুবুলের মা

যে ও। পরপুরুষ, তার চোখে হলেও, তাকে চুমু খেল। সে কি খারাপ মেয়ে ? ভাবছিল কিশা।

কিশার এখন খারাপ লাগতে লাগল।

অরি ভাবছিল, মারাত্মক ভুল করল ও। আগুন একবার জ্বালালে সে আগুন ধীরে ধীরে জোরই হয়ে ওঠে। আজকের চাঁদের রাতে, পিউ-কাঁহা আর কোকিলের ডাকের মধ্যে এই চোখের আলতো চুমু কালকে অনেক গভীরতর মধুর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাবে তার মনে।

কি লাভ, কি লাভ ?

কিশাও একদিন ওর স্বামীর স্বার্থে, ওর টুবুলের স্বার্থে ; রুমির মতই ওকে পথের ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দেবে। এত' জানাই। তবু কেন ? কেন এমন ভিখিরী সাজানো নিজেকে, এত ছোট করা ; এত কষ্ট পাওয়া ? আরো কষ্ট পেতে হবে জেনেও ?

পিকু ও অরি

গাড়িটা এসে যখন দাঁড়ালো তখন অন্ধকার বারান্দায় বসা পিকু কোনো কথা বলল না।

ঘর থেকে টুবুলের কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছিল।

কিশা বারান্দাতে উঠেই বলল, কি হয়েছে ? টুবুলের কি হলো ? কাঁদছে কেন ?

আমি মেরেছি ওকে।

কেন ? মারলে কেন ?

মার কাছে যাবো, মার কাছে যাবো বলে বায়না করছিল।

তারপরই বিরক্তির গলায় বলল, তোমরা কি চা বাগানে গেছিলে চা খেতে ?

অরি অধোবদন হয়ে রইল। পিকু ইতিমধ্যেই একটু হাই হয়ে গেছে। ভাল হুইস্কি দেখে বেশী খেয়ে ফেলেছে বোধহয় অল্প সময়ের মধ্যে।

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে অরি বলল, দোষটা আমার। কিশাকে ঘাটের উপরে কিছুটা দূর অবধি নিয়ে গেছিলাম। আমিই !

পিকু রুক্ষ গলায় বলল, বেশ করেছিলে, কিন্তু বলে গেলে কি হত ?

কিশা বলেছিল সে কথা। মানে, বলে যাবার কথা। আমারই দোষ। আবার বলল অরি।

পিকু বলল, এরকম কোরো না অরিদা। বিয়ে-টিয়ে তো করো নি। স্ত্রী থাকলে বুঝতে, কত চিন্তা হয়। নিজের স্ত্রী থাকলে পরের স্ত্রীকে নিয়ে না বলে কয়ে এমন হুট করে চাঁদের আলোয় পাগলা হয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে পারতে কী-না সন্দেহ।

অরি কি বলবে ভেবে পেলো না। বলল, আমারই দোষ।

হঠাৎ পর্দা ঠেলে বারান্দাতে এসেই কিশা পিকুকে বলল, সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না আমার।

পিকু বলল, বিয়ে করলে অলিখিত নিয়ম কিছু মেনে চলতেই হয়। এরকম স্বাধীনতা থাকে না; অন্ততঃ থাকা উচিত নয়।

কিশা বলল, তোমার সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছে নেই আমার। কিন্তু এও বলছি, আমি তোমার .....।

তর্ক কোরো না, আমি পছন্দ করি না যে আমার স্ত্রী, আমার সঙ্গে তর্ক করুক।

কিশা বলল, এখানে আসাই ভুল হয়েছে।

পিকু বলল, আমিও সেই কথাই ভাবছি।

ঘরে চলে যেতে ইচ্ছা করছিলো অরিরও। কিন্তু পাছে পিকু কিছু মনে করে, তাই শক্ত হয়ে চেয়ারে বসে রইল। বাইরে তাকিয়েই আবার চোখ ভিতরে করল। বাইরে তাকালেই বাংরিপোসির পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে। এখনও ওর নাকে কিশার প্রসাধনের গন্ধ, সাবানের গন্ধ, শাড়ির গন্ধ লেগে আছে।

বড় তাড়াতাড়ি স্বপ্নটা ভেঙে গেল। জানতো অরি। অরি ভালো করেই জানতো যে এমন হবে।

একটু পরেই কিশা ঘর থেকে বেরিয়ে টুবুলকে সঙ্গে করে চৌকিদারের ঘরে গেলো। রান্নাটা হলেই খাইয়ে দেবে টুবুলকে।

পিকু বলল, তোমার গ্লাসটা শেষ করো।

হুঁ।

পিকু বলল, হুঁ কি ?

তারপর বলল, বুঝলে অরিদা, জারু আর গরু শক্ত হাতে রাখতে হয়। তোমার না হয় বয়স হয়েছে, চুল পেকে গেছে, তোমার মধ্যে না হয় কিশার ভালো লাগার মত কিছুই নেই। তোমার সামর্থ্য নেই যে, তুমি ওকে কেড়ে নেবে আমার কাছ থেকে। কিন্তু এমন কেউ তো আসতে পারে যার সামর্থ্য আছে! এই সব ব্যাপারের প্রতি আমার এ্যাটিচুডটা কি তা কিশাকে বুঝিয়ে দিলাম।

অরি বলল, তুমি হাই হয়ে গেছে। কটা খেয়েছো ? খুব কুইক্‌লি খেয়েছো বুঝি ?

ফুঃ। তোমার অসামর্থ্যর কথা বললাম বলেই হাই হয়ে গেছি!

তা নয়। নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে এরকম আলোচনা বাইরের লোকের সঙ্গে না করাই ভালো।

বাইরের লোকই যদি হবে তুমি, তাহলে কিশাকে নিয়ে এই রাতের বেলা উধাও হয়ে গেলে কেন ?

অরি চুপ করে রইল।

পিকু বলল, গ্লাসটা এগিয়ে দাও।

অরি বলল, আমার ভাল লাগছে না।

লাগবে, বলেই পিকু জোর করে উঠে গ্লাসটা নিয়ে তাতে বড় করে হুইস্কি ঢালল। তারপর অরির দিকে এগিয়ে দিয়ে বাথরুমে গেল। যেতে যেতে বলল, আমাকে ব্ল্যাক ডগ খাইয়ে নিজে না খেয়ে তুমি বাহাদুরী করতে চাও। এই তোমার আরেক রকমের বড়লোকি চাল।

অরি নিজের গ্লাসের অনেকখানি পিকুর গ্লাসে ঢেলে দিল। এমনিতেই ও অপ্রকৃতিস্থ আছে—আরো অপ্রকৃতিস্থ হচ্ছে পিকুর কথা শুনে। তার উপর হুইস্কি খেয়ে সেই অপ্রকৃতিস্থতা আর বাড়াতে চায় না ও।

অরির একবার ইচ্ছে হল যে পিকুর এই দম্ভ ভেঙ্গে দেয়। তার সামর্থ্য আছে কি নেই প্রমাণ করে। পিকুটা বড় ছেলেমানুষ। আর যাই-ই বুঝুক, ও মেয়েদের একেবারে বোঝে না।

পিকু ফিরে এল।

কিশাও বারান্দাতে উঠে এল একহাতে প্লেটে খাবার নিয়ে অন্য হাতে টুবুলের হাত ধরে।

পিকু কিশাকে শুনিয়ে বলল, যা বলছিলাম অরিদা : তোমার সামর্থ্য থাকে আর কিশা যদি রাজী থাকে তাহলে তোমরা রাত ভর জঙ্গলে চাঁদ দেখে বেড়াও। আর বাইরে না যেতে চাও তো তোমার ঘরেই কিশাকে নিয়ে যাও। কিশা আজকে তোমার কাছেই শুক না কেন ? আমার তাতে বিন্দুমাত্র এসে যায় না।

কিশা বিরক্ত গলায় বলল, অরিদা। এই বোতলটা আপনি ঘরে নিয়ে যাবেন ?

নাঃ নেবে না। বোতলটা কোনো ফ্যাকটার নয়। আমি পুরোপুরি সেন অ্যান্ড সোবার। কথাগুলো বোধহয় তোমার শুনতে ভালো লাগছে না। সত্যি কথা সব সময়ই অপ্রিয়।

তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। কিশা টুবুলের থালায় ভাত মাখতে মাখতে থালার দিকে তাকিয়ে বলল।

আমার, না তোমার ? পিকু বলল।

আঃ।

কিশা বলল। টুবুল এখন খাবে। টুবুলের সামনে কি করছ যা-তা। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

যারা সত্যি কথা বলে তাদের সকলেরই মাথা খারাপ। অন্তত লোকে তাই রটিয়েছে চিরদিন। সক্রেটিস্, গ্যালিলিও.....।

প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে কিশা বলল, টুবুল নুন ঠিক হয়েছে বাবু ?

হাঁ। বলে মাথা নাড়ল।

আরেক টুকরো আলু দেবো, মেখে ?

না।

পেট ভরে খাও। খেয়ে নিয়ে, ভালো করে ঘুমোও। গরম নেই একটুও। অনেকক্ষণ ঘুমিও সকালে ? কেমন ?

তারপর বলল, টুবুলবাবুর তো আর স্কুল নেই কাল যে, তাড়াতাড়ি উঠতে হবে।

টুবুল ভাত-ভরা মুখে বলল, তিক্।

অরি জিজ্ঞেস করল, টুবুলকে আলুভাজা দিয়েছে ?

নাঃ। কিশা বলল।

কেন ? না কেন ? বলেই, অরি উঠে চৌকিদারের ঘরের দিকে যেতে গেল।

কিশা বলল, আলুভাজা খেয়ে ফেলেছে হইস্কির সঙ্গে সব।

ও। স্বগতোক্তি করল অরি।

তারপর বলল, আর একটু ভাজতে বলব ?

সব আলুই ভেজে দিয়েছে। আর নেই।

মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী। দুম্ করে বলল পিকু। যার ছেলে তার মাথাব্যথা নেই। তুমি কে হে পীরিতের লোক !

অসহ্য লাগছে আমার। আমরা এখুনি চলে যেতে পারি না অরিদা ?

কিশা টুবুলকে খাওয়ানো বন্ধ রেখে বলল।

অরি কথা না বলে এবারে উঠল।

বলল, খাবার সময় আমাকে ডেকো।

তারপর পিকুর দিকে ঘুরে বলল, পিকু, পরে কথা হবে।

আর কোনো কথা নেই।

জাঁড়িয়ে জাঁড়িয়ে বলল পিকু।

তোমার সামর্থ্য নেই। এটাই শেষ কথা যে তুমি আমার বউকে নিয়ে এক ঘন্টা চাঁদ দেখাতেই পারো। ব্যাসস্ এইটুকু। পয়সা থাকলেই মানুষ সব পায় না জীবনে।

অরি যেতে যেতে ফিরে দাঁড়াল।

বলল, হয়ত তাই-ই।

তারপর বলল, সত্যিই পারি না আমি।

পিকু খুব জোরে হেসে উঠল। মেটে-রঙা কুকুরটা ভয় পেয়ে কেঁউ কেঁউ করে উঠল। টুবুল খাওয়া থামিয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পিকু কেটে কেটে বলল, পারো না ! সে-এ দ্যাট্। হোয়াই ডোন্ট উ্য সে দ্যাট্। সে-এ দ্যাট্।

আবার বলল, সে-এ দ্যাট্।

অরি ভাবল, মদ বড় খারাপ জিনিস।

মনে পড়ল, অনেকদিন আগে বিহারের গ্রামের এক মাহাতো তাকে বলেছিল; 'পিনেওয়ালা আদমি ঔর কাটনেওয়ালা জানোয়ারসে বহত্ দূরমে রহনা।'

স্তম্ভিত, বাক্‌রুদ্ধ হয়ে অরি নিজের ঘরে এসে জানালার সামনে বসল।

আশ্চর্য! একজন মানুষের প্রতি অন্যজনের কী গভীর বিদ্বেষ লুকানো থাকে। কী জঘন্য, নির্দয় অনুভূতি। অথচ সাধারণ অবস্থায়, শহরে, প্রতিদিনের ব্যবহারে তা কখনও প্রকাশিত হয় না। কতরকম গোলমেলে কমপ্লেক্স্। ভাবাও যায় না। পিকুকে অরি গত কয়েকবছরে তাহলে একেবারেই বুঝতে পারেনি। মাঝে মাঝে শুধু অরির স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে ঠেস্ দিয়ে কথা বলতে শুনেছে ওকে। তাতে অরি অভ্যস্ত। পিতৃপুরুষের সঞ্চিত রোজগারে আলস্যে গা-ভাসানো বেচারাম বাবুদের কথা বাদ দিলে, স্বোপার্জিত অর্থে মোটামুটি স্বচ্ছল বাঙালী কোলকাতা শহরেই বা কজন আছেন? তবুও, সব গরীব বাঙালীই তাদের গরীবতর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে প্রতিনিয়তই বড়লোক বলে খোঁটা খান।

এই ভিখিরী এবং পরশ্রীকাতরদের দেশে স্বচ্ছলতা বড়ই দোষের।

কিন্তু পিকু অন্যান্য যেসব কথা বলল, এখন সেগুলো? পিকুর কোনো ক্ষতিই তো করেনি অরি। তবে কেন এইসব অসংলগ্ন, এলোমেলো, অহেতুক কথা!

কিশা যে তাকে এক বিশেষ চোখে দেখে—ভালো লাগার, সহমর্মিতার চোখে—সেইটাই কি অরির এতবড় অপরাধ! পিকুর হঠাৎ ক্রোধের কারণ?

ও আর ভাবতে চায় না।

সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব।

দাম্পত্য

খেতে আর কারোই ইচ্ছে ছিলো না, তাছাড়া খাবারও ছিলো না বিশেষ! চমৎকার করে রাঁধা মুরগীর প্রায় সবটাই পিকু খেয়ে ফেলেছিল। হুইস্কি খেয়ে ক্ষিদে বেশী হয়েছিল বোধ হয় ওর! অরি আর কিশার জন্যে দু টুকরো মাংস পড়েছিল। অরি ভাল টুকরোটা জোর করেই কিশার পাতে তুলে দিয়েছিল। আপত্তি করতে গিয়েও চুপ করে গেছিল কিশা, পাছে পিকু আবার কোনো গোল বাধায়!

বাথরুমে গিয়ে পা ধুয়ে অন্ধকারে ঘরে বসে ক্রীম মাখছিল কিশা, হাতে, মুখে, গলায়। রোজকার অভ্যেসবশত। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছিলো ঘরময়। খালি গায়ে আণ্ডারওয়্যার পরে খাটের উপর অসভ্যর মত চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল পিকু। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। পাশের খাটে টুবুলও অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

কিশা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, পর্দাটা তুলে দিয়ে। বাইরে কেউ কোথাও নেই। ধূ-ধূ চন্দ্রালোকিত মাঠ ডানদিকে। আগামীকাল পূর্ণিমা! ঝোপ-ঝাড়; দু'একটা গাছ। ঘরটার সোজাসুজি একটু দূর থেকেই জঙ্গল শুরু হয়েছে। প্রথমে ঝাঁটি জঙ্গল, তারপর বড় বড় গাছ—পাহাড়ের পায়ে গড়িয়ে গিয়ে জড়িয়ে গেছে; তারপর গায়ে গিয়ে মিশেছে।

মন্ত্রমুগ্ধর মত চেয়েছিলো ও, বোঝবার চেষ্টা করছিল সন্ধ্যেবেলাতে বাংরিপোসির ঘাটের ঠিক কতখানি অবধি ওরা উঠেছিল। দেখার চেষ্টা করছিল, সেই ভিউ পয়েন্টের জায়গাটা দেখা যায় কিনা এখান থেকে?

এমন সময়, হঠাৎ পিকুর গলার স্বরে ভীষণই চমকে উঠলো কিশা। ভয় পেলো বাইরের ছমছমে রাতের দিকে চেয়ে। আরো বেশী চমকালো খাটের উপর অপ্রকৃতিস্থ পিকুর উঠে বসা দেখে।

পিকু বলল, এসো। এত দেরি করছ কেন?

কিশা জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে অবাক গলায় বলল, কিসের দেরী? কেন আসব?

কেন মানে? ন্যাকামি করো না।

কি বলছ কি? আজকে?.....কিছুতেই না।

এসো তাড়াতাড়ি! চাপা ধমকের সুরে বলল পিকু।

তারপর জড়ানো গলায় বলল, আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

কিশা বলল, একদম নয়। আমি দারুণ টায়ার্ড। তোমার ঘুম পাচ্ছে তো ঘুমিয়ে পড়।

কথা বাড়িয়ো না। ভাল হবে না কিন্তু।

গলা চড়িয়ে বলল পিকু।

কিশা গলা আরও নামিয়ে এনে বলল, আস্তে কথা বলো, নির্জন জায়গা, পাশের ঘরে অরিদা আছেন; শুনতে পাবেন। তুমি কি সবসময়েই জোর করবে? গায়ের জোরেই?

গলা আর একটু চড়িয়ে পিকু বলল, হ্যাঁ। গায়ের জোরেই। এসো তুমি। বিয়ে করা বউকে আদর করব শুনতে পেলে শুনবে? যদি কোনো এঁড়ে গরু আড়ি পাতে তাতে কী এলো গেল?

কিশার আড়ষ্ট অনিচ্ছুক শরীরটা আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো খাটের দিকে। মনটা পড়ে রইল বাইরের বনে প্রান্তরে; পাহাড়তলির পিউ-কাঁহা পাখির ডাকের মধ্যে, করৌঞ্জ আর মহুয়ার গন্ধে; অরির ক্ষণিক সান্নিধ্যের স্মৃতিতে।

পিকু এক টানে কিশাকে খাটে ওর পাশে শোওয়ালো। তারপর উঠে বসল। মৃতদেহের উপর মাংসলোলুপ দুর্গন্ধ হায়নার মত।

চাঁদের স্পষ্ট আলোয় জানালার শিকের ছায়াগুলো খাটের উপর এসে পড়েছিলো। সাদা বিছানার উপরে, মেঝেতে; কালো লম্বা লম্বা ছায়াগুলোকে দেখে কিশার মনে হল, ঘরটা,

খাঁচটা, যেন একটা গরাদ দেওয়া মস্ত খাঁচা। আর সেই খাঁচার মধ্যে ও আর পিকু। একজন শরীরসর্বস্ব লোক, যে ওকে খেতে পরতে দেওয়ার বিনিময়ে, লাইফ ইন্সিওরেন্সের মোটা প্রিমিয়াম দিয়ে ওর ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করে কিশাকে এ জীবনের মত বন্দী করে ফেলেছে নিজের হারেমে।

অদ্ভুত এই হারেম।

এক বেগমের হারেম। অনাড়ম্বরের; বড় হেলা-ফেলার। এখানে ফুলের কিংবা আতরের গন্ধ নেই, ধূপ জ্বলে না, নৃত্য গীত বাদ্য কাব্য সাহিত্য সবই এখানে মানা।

মন বিবর্জিত একটা শরীর, শুধুই একটা শক্ত-সমর্থ শরীর, বিযুক্ত-মন একটা নারী শরীরের নরম নিভৃত গহ্বরে কী যেন খুঁজে চলেছে। একটা যন্ত্রের মত। ক্রমাগত।

কি খুঁজছে ? মণি-মুক্তো ?

ভাবলো, কিশা।

কেউ কি পায় ? হয়ত পায়; কেউ কেউ.....

খাটটা থেকে একটা অস্বস্তিকর কিঁচ্ কিঁচ্ আওয়াজ উঠছিল। অরিদা জেগে থাকলে নিশ্চই শুনতে পাচ্ছে; বুঝতে পাচ্ছে। কী লজ্জা !

ঠোঁটটা বিরক্তিতে কামড়ে ধরল কিশা। শরীরটাকে যথা সম্ভব আলগা করে এলিয়ে দিল। খাজনা দিচ্ছে বর্গীকে। মিষ্টি কথা, একটু ফুল, একটু হাসি, দুগাছি সস্তা চুড়ির বিনিময়ে মেয়েরা সর্বস্ব দিতে পারে একথা জানে না এই বোকা বর্গী। কেবলই শাসায়, কেবলই চোখ রাঙায়; ধান ফুরালেও ক্ষমা নেই।

খাঁচার মধ্যের নরম, দুধলী পাখির মত কিশা। এই পাখিটার শরীর প্রায়ই কুরে কুরে খেয়ে যায় এই হুলো বেড়ালটা। পালক ছিন্নভিন্ন করে চলে যায়। পাখিটার নরম মসৃণ পালকের আড়ালে যে একটা নরমতর বুক আছে, আর সেই বুকের ভিতর যে একটা তুলতুলে লাজুক মনও আছে তার কোনো খোঁজ রাখে না হুলো।

কিশার শরীরের মধ্যেও মণিমুক্তো যে আছে, তা পিকু জানেনি কখনও। অন্ধকার শরীরের অভ্যন্তরে মনের নরম উজ্জ্বল মোম জ্বেলে প্রবেশ করলে নিশ্চয়ই খোঁজ পেতো কোনোদিন।

হঠাৎ পিকু উঠে পড়ে পাশ ফিরে শুল। একবারও জিজ্ঞেস করেনি কিশাকে কিছু, কখনও ভুলেও জানতে চায় না কিশার ভালো লাগা-না-লাগার কথা। শুধু আজ রাতেই নয়; কোনোদিনও। যতদিন বিয়ে হয়েছে, একদিনও জানতে চায়নি সে।

পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল পিকু। টুবুলের চেয়েও বেশী কাদা হয়ে।

কিশা আশাভঙ্গতায় হাই তুললো একবার। কিছুক্ষণ বসে রইল বিছানায়। আবোল তাবোল ভাবল। তারপর উঠে বাথরুমে গেল। ফিরে এসে ক্রীম মাখল মুখে নতুন করে।

জানালাতে আবার ও দাঁড়াল গিয়ে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কিশার ঠোঁটের কোণে এক হিমেল নিষ্ঠুর হাসি ছড়িয়ে গেল।

বাইরে হাওয়া ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে। ডালপালা ঘাস সব দোলাদুলি করছে! একটা কোকিল ডাকছে বাংলোর সামনের দিক থেকে। থেমে থেমে। এই বসন্তে কোলকাতায় একদিনও কোকিলের ডাক শোনেনি ও। 'কখন বসন্ত গেলো, এবার হলো না গান।' কিশার বড় প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত এটি। হঠাৎ মনে পড়ল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে টুবুলের পাশে এসে শুল কিশা। আজ কেন এমন হচ্ছে তাও জানে না কিন্তু পিকুর পাশে শুতে ওর বড়ই ঘেন্না করছে। এমন কখনও হয়নি আগে। এতবছরে।

ঘুম আসছিল না। শুয়ে শুয়ে খোলা জানালায় তাকিয়ে অনেক কথা ভাবছিল ও।

অরিদা ওর চেয়ে কত বড় হবে বয়সে? আট-দশ বটেই। অনেক বড়। পিকু ওর চেয়ে দু বছরের বড়। ওর বন্ধুর মত পিকু। অন্তত ও তাই-ই হবে ভেবেছিল। অরির মধ্যে যে বড় বড় ভাবটা আছে, ওর কপালের দুপাশের রুপোলী রেখা; ওকে দেখে মনে হয় পিকুর উপর যতখানি না নির্ভর করে, করতে পারে কিশা তার চেয়ে অনেক বেশী ধীরা অরির উপর। সবসময় শুধু বন্ধুত্বে মন ভরে না। মন আরো বেশী নির্ভরতা গুণসম্পন্ন কিছু যেন খোঁজে।

পিকুর মা ভারী ভাল মানুষ। কিশা নিজের মাকে ছোটবেলায় হারিয়েছিল—তাই পিকুর মাকে পেয়ে ও খুব খুশি। পিকুর বাবাও চমৎকার মানুষ। কিশাকে ছাড়া এক সেকেণ্ড চলে না। টুবুল তো সবসময়ে দাদু-দিদার কাছেই কাটায়। ওর স্কুল এখনও খেলার স্কুল।

কিশার একই ননদ। রানু! তার বিয়ে হয়ে গেলো গত মাসে। বেশ ছেলেটি। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরা সাধারণত বড় বেশী প্র্যাকটিকাল আর বেরসিক হয়। এ ছেলেটি অন্য রকম।

কিশা ভাবছিল, সেই ছেলেটি হয়ত পিকুর মত অন্ধ ও স্বার্থপর হবে না। চোখ থাকলেই সবাই সবকিছু দেখতে পায় না। মন থাকলেই অনুধাবন করতে পারে না। পিকু যেরকম! ও যা পায়নি, রানু যেন তা পায়। কিশা ভাবছিল।

অরিদা এখন কি করছে কে জানে? বড় অদ্ভুত মানুষটা। এত বেশী নরম বলেই বোধহয় এত দুঃখী।

অরিদার বাড়িতে অনেকদিন নেমন্তন্ন খেয়েছে পিকু-কিশা। একদিন পিকুর বাবা-মা-রানুকে নেমন্তন্ন করেছিলেন অরিদা। চমৎকার, ছোট ছিমছাম বাড়ি। দেখাশোনার লোকজন আছে, কিন্তু আপনজন কেউ নেই। একজনও না। যোগেন বলে একজন পুরোনো চাকর আছে, মেদিনীপুরীয়া। ভোলাভালা একা ব্যাচেলরের সংসারে চুটিয়ে চুরি করে মেদিনীপুরের গ্রামে সে জমিদারই হয়ে গেছে নাকি!

অরিদা সারাদিন নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকেন। কারখানা বেহালাতে এবং অফিস পার্ক স্ট্রীটে। সব শেষ করে বাড়ি ফেরেন আটটা নাগাদ। এসেই লাইব্রেরীতে ঢোকেন। লাইব্রেরীতেই থাকেন বেশী। ওখানেই যোগেন খাওয়ার এনে দেয়। বই বড় ভালোবাসেন অরিদা। সে কারণেই কিশার সঙ্গে অরিদার এক বিশেষ সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। বই-ই ওদের দুজনের মূল যোগসূত্র।

বইয়ের মত বন্ধু হয় না, বইয়ের জগতের মত জগৎ আর দুটি নেই। বই দুঃখ দেয় না, ধার বলে টাকা ধার নিয়ে সে টাকা শোধ না দিয়ে নিজেকে ছোট এবং বন্ধুকে ব্যথিত করে না। বইয়ের ঈর্ষা নেই, বই পরশ্রীকাতর নয়, যারা জীবনে অনেক করেছে অন্যের জন্যে এবং বদলে অনেক বঞ্চিত ও অপমানিত হয়েছে, তাদের কেবল বইয়ের জগতে বাস করাই ভাল। তাতে শুধুই আনন্দ। বই সম্বন্ধে এসব কথা কিশার নয়, অরিদাই একদিন বলেছিল কিশাকে।

অরিদা....মানুষটা অন্যকে এত আদর যত্ন করতে জানে অথচ তাঁকে যত্ন করার কেউই নেই ! পিকুর কাছে শুনেছিল কিশা যে উনি একজনকে ভালোবাসেন। প্রথম যৌবন থেকে। এখনও নাকি বাসেন। কিন্তু সে মহিলা এখন বিবাহিতা। স্বামী-কন্যা নিয়ে সুখেই নাকি আছেন। অরিদার একটা খোঁজ পর্যন্ত নেন না। তার ভালোবাসার খেলা শেষ। খেলা যা খেলার সাঙ্গ হয়েছে সবই; ফুরিয়েছে শীত, পাহাড়ে ফিরেছে পাখি।

মহিলা কেমন, জানতে ইচ্ছে করে কিশার। কে তিনি, যিনি এমন মানুষের ভালোবাসাও অত সহজে ফেরাতে পারেন ? কেউ যে পারেন ফেরাতে, একথাটা বিশ্বাসই হয় না কিশার। অরিদাকে কাছ থেকে জেনে গত কয়েক বছর ঘনিষ্ঠভাবে মিশে, ওঁর সম্বন্ধে তার কোনো সংশয় নেই। বিবাহিতা সে, তা সত্ত্বেও অরিদাকে এক বিশেষ ভালোবাসা বাসতে যদি বাধ্য হয়ে থাকে কিশা তবে মহিলা অরিদার এত মনোযোগ পেয়েও ভালোবাসেন না অরিদাকে একথা বিশ্বাস হয় না।

কিশা ভাবে, দুটি ব্যাপার হতে পারে। এক; মেয়েটি নিরুপায়। সব মেয়েই নিরুপায়, কম বেশী; এ দেশে। যাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই, সামাজিক সাহস নেই, যারা যথেষ্ট শক্ত হাতে নিজেদের সুখ ছিনিয়ে নিতে পারে না সংসারের কাছ থেকে তারা প্রায়ই অন্যকে দুঃখ দিতে বাধ্য হয়। সেই দুঃখ দেওয়ার মধ্যে নিজের যে দুঃখ কতখানি তা সেই মেয়েরাই জানে।

এ-ও হতে পারে যে, মেয়েটি অরিদাকে যে ভালোবাসে বাসে, অরিদা সেই ভালোবাসাতে সন্তুষ্ট নন। মেয়েরা যা দিতে পারে তা হাসিমুখে খুশি হয়েই দেয়; আর যেটুকু দিতে পারে না তাদের প্রিয়জনকে, ভালোবাসার জনকে, সেটুকু না দিতে পারার দুঃখ বড় কঠিন হয়েই বাজে তাদের বুকে এই কথাটা কোনো পুরুষ কখনই বোঝে না, বোঝেনি। হয়ত অরিদাও বোঝেনি।

তাই-ই যদি হয়, তবে বড় বেচারী মেয়েটি ! বেচারী অরিদাও।

যে অরিদার ভালোবাসা এমন করে পেয়েছে সে কে ? তাকে যে বড় দেখতে ইচ্ছে করে কিশার। সে কি খুব সুন্দরী ? দারুণ বিদুষী ? তার এমন কি আছে, যা কিশার নেই ? কিশা কি অরিদার কাছে তার মত প্রেয় হয়ে উঠতে পারে না কখনও ? চেষ্টা করবে কি কিশা ?

এর বেশ একটা নেশা আছে। এই পরকীয়ার। এই লজ্জামাখা ভয় ভয় গোপনীয়তার, এই ভালোবাসার; এই ঝুঁকির। এর আনন্দ যে কতখানিতা এই সন্ধ্যেতে তার চোখের পাতার দুটি চিকন চুমুই বলে দিয়েছে ! শরীরে আগুন ধরে গেছিল কিশার। পা কাঁপছিলো থর্‌থর করে। কী করে যে গাড়িতে এসে দরজা খুলে বসেছিল সে ও-ই জানে।

কেন এমন হয় ? পরকীয়া প্রেম শুধু করার জন্যেই করা যায় না। প্রেম কখনই প্রেম করব বলে করা যায় না। তাকে প্রেম বলে না।

একটা বোধ থাকে, পরিচয় থাকে, অনেক দিনের জানা-চেনাও থাকে, ভালোলাগা থাকে, পছন্দ থাকে, কিন্তু কোন্ মুহূর্তে যে কোন অচিন দেশের অনামা পাখির ঠোঁট থেকে বীজ হঠাৎ পড়ে জীবনের মিশ্রগন্ধী মাটিতে; আর তা থেকে রাতারাতি প্রেম জন্মায় তা ভাবলেও অবাক লাগে।

অরিদাকে জানে কিশা অনেকদিন থেকে। সেই জানা ক্রমশ গভীর হয়েছে। দুজনের রুচি, মানসিকতা; পছন্দ-অপছন্দ মিলেছে। ভালো লেগেছে দুজনের দুজনকে। কিন্তু সেই ভালোলাগা আজ এই চাঁদের রাতে এমন নিঃশব্দে ভালোবাসা হয়ে ফুলের গন্ধে পাখির ডাকে ভাস্বর হবে, চোখের চুমুর শীলমোহর পড়বে তাতে, তা আজ সকালেও জানতো না কিশা। যখন কোলকাতা থেকে রওয়ানা হয় একসঙ্গে, তখন একবারও ভাবেনি যে বারো ঘন্টা পড়ে তার জীবনে এমন এক আবর্ত উঠবে।

ভালোবাসা এমনই। লুকিয়ে থাকে, লুকিয়ে আসে, লুকিয়ে ফোটে আবার কোনোদিন এমনি করেই লুকিয়ে ঝরে যায়। তার আসা-যাওয়ার, বাসা-বাঁধার, ঝরে-যাওয়ার শব্দ শোনা যায় না কানে। দেখা যায় না তাকে।

অরিদাকে যে-কোনো মেয়েরই ভালো লাগবে। লাগতে বাধ্য। কিশা কি শাড়ি পরেছে অথবা কি সাবান মাখে অথবা কিশা বড় টিপ পরেছে না ছোট টিপ অথবা কিশা চা-টা দারুণ বানিয়েছে কি বানায়নি, ফুলদানিতে কি ফুল এবং কেমন ফুল সাজিয়েছে এসব পিকুর চোখে কখনও পড়েনি। পড়বেও না।

কিশা জানে যে, শাড়ির খোল আর শাড়ির পাড়টা কেমন তা শুধু মেয়েদেরই আলোচ্য বিষয় নয়। সব মেয়েরাই আসলে পুরুষদের ভালোলাগা এবং স্তুতি পাওয়া এবং অন্য মেয়েদের প্রশংসা এবং ঈর্ষা জাগানোর জন্যেই সাজে। এই মেয়েদের সাজগোজে যদি কোনো

পুরুষের দৃষ্টি থাকে, তার সুন্দর শাড়ির, তার চুল-বাঁধার বা তার ফুল সাজানোর প্রশংসা যদি কেউ করে, তা হলে পুরুষের মধ্যে তাকে ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়।

রানু বলত, ছেলেরা এই সব নিয়ে মাথা ঘামালে মেয়েলী মেয়েলী লাগে না ?

কিশা হাসত। রানু তখনও সব বুঝতো না। বিয়ের পর ওরও কেটে যাক পাঁচ বছর, ও তখন বুঝবে, পুরুষ আর নারীর শারীরিক সম্পর্কর মতই, রুচি-অরুচি, পছন্দ-অপছন্দ, দেখা-না-দেখা কত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত দাম্পত্য সম্পর্কে। বিয়ের আগে কোনো মেয়েই সেটা জানে না হয়ত। বড় একঘেয়ে, বড় দাসত্বর, বড় ভুলে-থাকা, ভুলিয়ে রাখার এই বিবাহিত জীবন। মেয়ে মাত্রই জানে।

অরিদা এখন কি করছে ? ঘুমিয়ে পড়েছে ? গরমের মধ্যে অনেকখানি গাড়ি চালিয়েছে বেচারা। ভারী নরম, রুচিবান, সৌন্দর্য-পাগল মানুষটা।

পিকু তো বলেই ছিল, যেতে পারে অরিদার কাছে, থাকতে পারে আজ রাতে কিশা, ও ঘরে; ওর কিছু যায় আসে না।

বলেছিল, সামর্থ্য নেই অরিদার।

যাবে কিশা ? তার অতৃপ্ত, অপমানিত শরীরকে ধন্য করবে নাকি গিয়ে; ধন্য করবে অরিদাকেও ? কি হয় ? একরাতে তার শরীরকে একজন দারুণ ভিখিরীর হাতে তুলে দিলে ? যা পিকুকে প্রায় রোজই দিতে হয়, অনিচ্ছায়, অভ্যাসবশে, অবহেলায়, সীমাহীন সামান্যতায়, তাই-ই একজনের কাছে পরম প্রাপ্তি হতে পারে। কিশা নিজের শরীরটাকে যুগলবীণার সঙ্গে কল্পনা করে। আর অরিদা ? স্বরোদ ? আলাপ, গৎ; তারপর ঝালা। এই মধুগন্ধভরা কোকিল-ডাকা রাতে চাঁদের আশীর্বাদে, যুগলবন্দী বাজাবে না কি ওরা ?

কীই-বা হারাবে কিশার ? কতটুকু হারাবে ? তার কাছে যা বড়ই সামান্য, বড় অকিঞ্চিৎকর সেই সামান্যতা গভীর অসামান্যতা বয়ে আনবে হয়ত ভিখিরী মানুষটার কাছে। যে মানুষের হাত তার মুখে লেগেছিল, যার নিঃশব্দ উৎসুক শালীন ঠোঁট তার চোখের পাতা ছুঁয়েছিল তার সঙ্গে অনঙ্গরঙ্গে মাতবে না কি সে ? তার শরীরের আনাচে-কানাচে যত অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, ফল্গু নদী অবহেলার অনাদরের বালিতে চাপা পড়ে আছে সেই সব নদীর শাখা-প্রশাখায়, চন্দ্রালোকিত কাশফুলের চরে-চরে, ঢল নামাবে ? নামাবে না কি ?

ও ওঘরে গেলেই, অরিদার শয্যাসঙ্গিনী হলেই সে কী অসতী হয়ে যাবে ? আর এ-ঘরে স্বামীর পাশের খাটে শুয়ে শুয়ে সে যে তার অন্তরের সর্বস্বতা নিয়ে অরিকে কামনা করছে সেটা বুঝি দোষের নয় ? অদ্ভুত এই সতীত্বের সংজ্ঞা, এই সামাজিক খাঁচা, এই প্রতিনিয়ত বঞ্চনা করা, আর বঞ্চিত হওয়া।

ভীষণ গরম লাগছে কিশার। টুবুল মশারি ছাড়া শুতে পারে না। জন্মের পর থেকেই

মশারিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে টুবুল। যেমন বিয়ের পর থেকেই পিকুতে অভ্যস্ত হয়েছে ও। এ একটা অভ্যাস। এই দাম্পত্য। মশারি-ঘেরা জীবন। কয়েদীরা এখানে জাঁতা পেষে, ঘানি ঘুরোয়, কিন্তু কয়েদীদের কোনো বিশেষ পোশাক নেই। মুখেও হাসি ফুটিয়ে রাখতে হয় সব সময়। অনেক লোক খাইয়ে, সানাই বাজিয়ে, বিয়ে করেছিল পিকু কিশাকে। এই কারাগারের কয়েদী করেছিল। পিকু তখন যজ্ঞের ধূমের মধ্যে অগ্নিসাক্ষী করে দুর্বোধ্য সংস্কৃত মন্ত্র বিন্দুমাত্র না বুঝে আউড়ে অনেক শপথও করেছিল। ফাঁকি; সব ফাঁকি।

বিয়েটা একটা বন্ধন। সারা জীবনের জন্যে এই বাঁধনেই বাঁধা পড়ে থাকবে কিশা?

তারপর টুবুল?

আসলে, আজকে পিকুর কোনো ভূমিকাই নেই। টুবুল যেই মা বলে ডাকে, কিশার বুকের মধ্যে কি সব ঝড় বয়ে যায়। টুবুলকে সেই-ই তৈরী করেছে। পিকুর ভূমিকা এ ব্যাপারে অতি নগণ্য। কিশার ছোটবেলার পুতুলগুলো প্রায় সবই হারিয়ে গেছে। কিছু আছে, বাবার বাড়ির কাঁচের আলমারিতে। টুবুল, তার জ্যান্ত পুতুল, তার রক্ত মাংস, তার বাল্যের, কৈশোরের, যৌবনের অনেক স্বপ্ন আর কল্পনা দিয়ে গড়া টুবুল আজ তার মুক্তির সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। তার জীবনের চলমান গাড়িতে টুবুলই ঘোড়া। গাড়ি হয়ে জুতে গেছে ও। নিজের নড়াচড়া করার আর পথ নেই কোনো।

যে টুবুলের জন্যে ওর এত ভাবনা, ওর বর্তমানকে তিলে তিলে নষ্ট করা অভ্যাসের জাঁতাকলে, সেই টুবুল কি বড় হয়ে দেখবে ওকে? থাকবে ওর কাছে? ও তো একুশ বছরের অতিথি! বড় হবে, পায়ে দাঁড়াবে, বিয়ে করবে নিজের মনোমত কাউকে। আলাদা থাকবে।

মাকে আর মনেই পড়বে না।

চোখের সামনে রমা মাসীকে দেখছে কিশা রোজ। মাসীর কেউকেটা ছেলে খোঁজ পর্যন্ত নেয় না মায়ের। মাকে কিছু টাকা দিয়েও সাহায্য করে না। বুড়ো বয়সে সেলাই করে আর কাঁথা বানিয়ে চলে রমা মাসীমার। এই টুবুলরা, ওদের প্রজন্ম; অকৃতজ্ঞতার ঝাড়। কিশা ভাবছিল, সবই যদি জানে, তবে জেনে শুনেও কেন এই আত্মবঞ্চনা। টুবুলের যখন একুশ বছর হবে, তখন কিশার বয়স হবে পঞ্চাশ। তখন অরিদার বয়স ষাট-টাট। কত বদলে যাবে পৃথিবী তখন। শরীর তখন আর এই ফুল-ফোটা, কথা-বলা শরীর থাকবে না, মন থাকবে না এই মন, অভ্যাসে, ব্যবহারে, জর্জরিত, ব্যবহৃত হয়ে ফুরিয়ে যাবে তখন কিশা।

জীবন তো চিরদিন থাকবে না, থাকবে না এই চাঁদের রাতের আহ্বান। সব জীবন, সব প্রেম, সব ভালোলাগাই একদিন শেষ হবে। চাওয়া ফুরোবে, পাওয়া ফুরোবে। যদি জীবন চির না-ই হয়, তবে এই জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে এত ভাবনা কিসের? কিসের

জন্যে ঠকানো নিজেকে ? যতটুকু ভালো লাগা তুলে নেওয়া যায় চলতে চলতে তাই-ই ও তুলে নেবে। অনেকদিন ঠকিয়েছে নিজেকে। আর নয়।

বিছানা ছেড়ে উঠে চান করল আবার কিশা। অরিদার সাবান দিয়ে। সাবানটা গায়ে ঘষার সময় মনে করলো অরির হাতই লাগছে তার গায়ে, তার শরীরের গোপন, নিভৃত সব স্থানে, যেখানে অরির হাত ছোঁয়াবার অধিকার নেই কোনো। সমাজ সে অধিকার তাকে দেয়নি ! কিশাও দেয়নি।

শাড়ি ছেড়ে ফ্রিল-দেওয়া হালকা হলুদ ফুল-ফুল কটনের নাইটি পরল ও। পাউডার মাখল সারা গায়ে। ওর পাগল পাগল করতে লাগল। ও আজ প্রথম স্বৈরিণী হবে ! ও নিজেকে তুলেই দেবে ঠিক করল অরির হাতে। অসতী হতে কেমন লাগে দেখবে ও, ফর আ চেঞ্জ। সতী আর অসতীর মধ্যে ব্যবধান একটা হালকা সাহসের পর্দার। অসতী মাত্রই স্বৈরিণী। তার নিজের টানে সে বাঁচে পৃথিবীতে; তার স্বাধীনতা নিয়ে। তার ব্যক্তিস্বাধীনতাকে দাম্পত্য সম্পর্কের পায়ে দুর্গন্ধ পাঁঠার মত বলি দিয়ে না। আর সতী যারা সেজে থাকে, সেই সব সতীই সতী নয়। সতীত্ব শুধুমাত্রই একটা শারীরিক ব্যাপার নয়। মনে মনে সতী কজন মেয়ে, সে বিষয়ে কিশার সন্দেহ আছে।

পাশ ফিরে শুলো পিকু। কুৎসিত লাগে ওকে, ঘুমোলে। খালি গায়ে, আণ্ডারওয়্যার পরে ভারী অশালীন দেখায় তখন। অনেকদিন বলেছে পায়জামা বা শ্লিপিং সুট পরে শুতে। কথা শোনে না ও। শোওয়ার ঘর মানেই, দাম্পত্য সম্পর্ক মানেই আব্রুহীনতা নয়। তা যে নয়, পুরুষরা বোধহয় সে কথা কখনও বোঝে না। ওর সমস্ত মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ওর সঙ্গে রুচির, সংস্কারের, মানসিকতার কোথায় যেন এক গভীর বিরোধ আছে পিকুর। সারাদিনে যত না বোঝে, রাতের বেলায় একা ঘরে সেটা মূর্ত হয়ে উঠে ওকে বড় পীড়া দেয় প্রতি রাতে। প্রতি রাতেই।

কিশা বারান্দায় দরজার দিকে গেলো। টুবুলের মশারিটা ভাল করে গুঁজে দিয়ে এল যাবার আগে।

দরজা খুলতেই, চাঁদের আলোয় চোখ ধেঁধে গেল ওর।

কে যেন বারান্দা থেকে বলল, তুমি ! ঘুমোওনি ?

চমকে উঠল কিশা !

অরি বারান্দায় ইজিচায়ারে বসে আছে। এখনও ?

কিশার মধ্যের হঠাৎ-সাহসী কদম্বগন্ধী স্বৈরিণী মুহূর্তে স্নিগ্ধা, ভীতা রমণী হয়ে গেল। এ তো চার দেওয়ালের ঘর নয়, এ যে খোলা বারান্দা। শহুরে মেয়ে খোলা জায়গায় কুঁকড়ে যায়। গুটিয়ে যায় তাদের মন : তাদের শরীর। নিজের সুতো-ছাড়া মনটাকে লাটাইয়ে দ্রুত গুটিয়ে নিল কিশা ! ছড়িয়ে ফেলা নিজেকে কুড়িয়ে নিল।

হঠাৎ পিকুর বাবার গলা শুনতে পেল কিশা।

ক'টা বাজল দ্যাখো তো বৌমা! আমার ব্লাডপ্রেসারটা নেবে না এবারে?

পিকুর মা বললেন, বৌমা, ডায়াবিনিজ কটা খাবো?

দূর থেকে কিশার ননদ রানু ডাকল, বৌ-দি। তোর জন্যে দৈ-বড়া এনেছি।

কিশার দু কানের মধ্যে হঠাৎ অ্যামপ্লিফায়ারে গম্ গম্ করে ডেকে উঠল টুবুলঃ মা। মা।

কিশা বলল, চললাম, অরিদা। গুড নাইট।

ইউস্‌লেস রোম্যান্টিক ফুল

অরি বলল, বোসো।

কিশা গিয়ে পাশের চেয়ারে বসল।

কিশার গায়ের সাবান আর পাউডারের গন্ধে বারান্দা ভরে গেল। অরি ভাবল, কিশার নিজের গন্ধটা কেমন জানা হলো না; হবে না। বাইরের রাতের নিমফুল, করৌঞ্জ আর মহুয়ার গন্ধ কিশার গায়ের সঙ্গে মিশে রইল। নাইটিটা গোড়ালির দু ইঞ্চি উপরে এসে থেমে গেছে। নীচে আর কিছুই পরেনি কিশা। তবু সুডৌল স্তনের দুধলী মসৃণ আভাস সেই কাশফুলের মত উজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলোতে স্নিগ্ধতর হয়ে ফুটে উঠেছে দুটি স্বপ্নিল ম্যাগনোলিয়া গ্ল্যান্ডিফোরা ফুলের মতন।

অরি ভাবল, তাহলে ও কিশাকে চায়। কিশার সম্পূর্ণ শরীরকেই।

কিছুতেই ঘুমোতে পারে না অরি। চেষ্টা করেছিল অনেক। সারা শরীর জ্বালা করছে! শুয়ে শুয়ে কল্পনায় কিশাকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করে অস্ফুট কত না আদরের কথা বলেছে এতক্ষণ। কল্পনায় আদর করেছে, আশ্লেষে।

কল্পনা বড় কষ্টের।

কল্পনায় কাউকে পাওয়া আনন্দের নয়, বড় প্রলম্বিত যন্ত্রণার তা; বড় অভিশাপের। বাস্তবের পাওয়া স্বল্পকালের। কিন্তু বাস্তবে পাওয়ার পর আর যে কল্পনা থাকে না।

হঠাৎ অরির মনে হল, কিশাকে পেয়ে গেলে, অরি কিশার কাছে পিকুর মতই একটা অভ্যাস হয়ে যাবে হয়ত। তার চোখের চুমু কিশার শরীরে মনে আর এমন করে শিহরণ তুলবে না।

কিশাও এক্ষুণি সেই কথাই ভাবছিল। অরিকে সে অরিই করে রাখতে চায় চিরদিন। কখনও পিকু করতে চায় না। বাস্তব বড় একঘেয়ে। চরম আনন্দও পুরোনো হয়ে যায়। পরম পাওয়াও অভ্যাসের কালীন হাতে কলুষিত হয়। তার চেয়ে এই-ই ভাল। অরি তাঁর স্বপ্নে থাকুক, তার মনে, তার শরীরে; প্রতি মুহূর্তে। বাস্তবের মধ্যে প্রত্যেক মানুষ

আর মানুষী প্রশ্বাস নেয়, নিঃশ্বাস ফেলে, নড়ে-চড়ে, খায়-দায়, ঘুমোয়, প্রাতঃকৃত্য সারে, দাঁত মাজে, কর্তব্য করে। কিন্তু মানুষ শুধু কল্পনার মধ্যেই সুন্দর হয়ে থাকে। কিশা ভাবছিল। সেই কল্পনার মানুষ মানুষীদের দাঁতে ময়লা জমে না, গরমে তারা ঘামে না, শীতে রুক্ষ হয় না, মৈথুনে অতৃপ্ত অথবা অতি-শ্রান্ত হয় না। অরি কিশার জীবনে কল্পনা হয়েই থাকুক। সেইভাবে থাকাটাই আসল থাকা; চিরদিনের থাকা। দৈনন্দিনতার নৈকট্যের দীনতা তাহলে কোনদিনই তাদের দুজনকে জীর্ণ করবে না, ফুরিয়ে ফেলবে না। এক অফুরান আনন্দে ভেসে চলবে ওরা দুজনে চিরদিন।

যাকে পাওয়া যায় হাত বাড়ালেই; তাকে ইচ্ছে করে না-পাওয়ার মধ্যে যে গভীর, তীব্র আনন্দ; তা কিশা এই মুহূর্তে হঠাৎ আবিষ্কার করল।

অরি নিঃশব্দে কিশার মাথায় হাত রাখলো। ওর সিঁথির উপর।

খোলা চুল কাঁধের উপর দিয়ে নামিয়ে দিয়েছে কিশা। সেই চুলে হাত ছোঁয়ালো অরি। অস্ফুটে বলল, আমাকে ক্ষমা করো, আমার জন্যে তোমার অনেক কষ্ট হলো আজ।

কিশার মনে পড়ল, পিকু তার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়েছিল বাসি বিয়ের দিন। অরি সেই সিঁথিতেই হাত রাখলো। কিন্তু হাত রাখা মাত্র তার সমস্ত শরীরের হাজার দুয়ারে, দশ হাজার বাতায়নে, অনেক বছর লাগাতার লোডশেডিং-এর পর হঠাৎ লক্ষ আলো জ্বলে উঠল দপ্ করে। শরীরের ভিতরে আনাচেকানাচে কোথায় কি যেন ঘটে গেল।

আশ্চর্য! কেন এমন হলো? কারো হাতের ছোঁয়ার বসন্ত বনের সব ফুল একসঙ্গে ফুটে ওঠে, আর অন্য কেউ সর্বাঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হলেও গরম লাগে! খারাপ লাগে। কিশা বড়ই পরীক্ষাতে পড়েছে। অরিকে কি শেষ পর্যন্ত ও দূরে রাখতে পারবে? তার সব সুন্দর কল্পনাই বুঝি আজই বাস্তবের স্বেদাক্ত অভিজ্ঞতাতে পর্যবসিত হয়! এত তাড়াতাড়ি?

কিশা বলল, ক্ষিদের জ্বালাতে ঘুম আসেনি বুঝি?

অরি বলল, কেন? খেলাম তো!

কি খেয়েছেন তা তো আমি দেখেছি। একজনই তো সব খেয়ে ফেলল।

অরি বলল, পেটের ক্ষিদেই কি সব? সে ক্ষিদে তো রোজই মেটে। মানুষের কতরকম ক্ষিদে থাকে। কি? থাকে না? তুমি এই যে আমার পাশে এসে বসলে, সব ক্ষিদে তৃষ্ণা ভুলে গেলাম আমি! আচ্ছা, কেন এমন হয় বলো তো? তোমার কাছে একটু থাকলে, তোমার চোখে চোখ রাখলে ভালোলাগায় আমি মরে যাই; এই বয়সেও।

আহা! বয়স, বয়স করবেন না। কী আপনার বয়স? পুরুষ মানুষের এই একটা বয়স নাকি?

বয়স আমার অনেক। তবে, আ ম্যান ইজ এজ ইয়াং এজ হি ফীলস্।

কিশা বলল, এন্ড আ উম্যান ইজ এজ ইয়াং এজ শী লুকস্।

অরি বলল, তোমাকে দেখে মনে হয় কুড়ি।

কিশা হাসল।

বলল, মিথ্যা কথা বলা অভ্যাস হয়ে গেছে আপনার।

ভালো, তো বাঁচতামই। অরি বলল। কত কি পেতে পারতাম জীবনে। মিথ্যা কথা বলতে পারি না আমি। তোড়জোড় করে মহড়া দিয়ে যদি বলেও বা ফেলি, পরমুহূর্তেই ধরা পড়ে যাই। কোলোকায়ী করে ফেলি। মিথ্যা বলে ফেলা সহজ; সামলানো ভারী কঠিন।

চাপা হাসি হাসল কিশা।

আর তারপর বলল, সকলের চরিত্রই অদ্ভুত। কার চরিত্রের সঙ্গেই বা অন্য কারো চরিত্রের মিল আছে? থাকলে তো মানুষ এত ইন্টারেস্টিং হতো না। প্রোটোটাইপ হয়ে যেতো একে অন্যের। পিকু কিন্তু খুব ভালো ছেলে।

ভালো ছেলে! কিশা রিক্তগলায় বলল। আমাদের দেরী হল বলে কি কাণ্ডটা করল বলুন তো?

ও যে তোমাকে ভালোবাসে। ও যে তোমাকে কতখানি ভালোবাসে আজই প্রথম বুঝলাম! সত্যিই তো, আমি বিয়ে করিনি। আমি কি করে বুঝব স্বামীর মনোভাব, স্বামিত্বর যন্ত্রণা। আমি তো আকাট। তোমাকে ভালোবাসে বলেই খুব রেগে গেছিল ও। ভালো না বাসলে রাগ করতো না।

কিশা বলল, রক্ষা করুন। এই নাকি ভালোবাসা।

অরি হাসল। বলল, ব্যাপারটা কী জানো, প্রত্যেক মানুষেরই ভালোবাসার প্রকাশটা আলাদা। কেউ কেউ রাগ করেই ভালোবাসে! তা বলে তার ভালোবাসাটা তো মিথ্যা নয়।

কিশা বলল, আমি কারো প্রশংসা শুনতে এত রাতে এখানে আসিনি।

অরি চমকে উঠল। লজ্জিত হল। সোজা হয়ে বসল।

বলল, সরি! বলো, তোমার জন্যে কি করতে পারি আমি, মুখে নাই-ই বা বললে, মনে মনে বলো। আমি বুঝে নেব।

বলেই, কিশার বাঁ হাতটা ওর ডান হাতের পাতার মধ্যে ধরল।

ফিসফিস করে বলল, কী সুন্দর আঙুল তোমার। ইচ্ছে করছে এই বারান্দায় এই সুগন্ধের মধ্যে এই আলোয় উড়াল রাতে তোমার হাত ধরে সারারাত বসে থাকি। আর কোনোদিনও ছাড়বো না এই হাত। আমাকে তুমি নিয়ে চল, কোথায় নিয়ে যাবে। আমার নিজের সব জোর ফুরিয়ে গেছে। কাউকে আর আপন ভাবার জোর নেই আমার, ভালোবাসার ক্ষমতা নেই; আমি ফুরিয়ে গেছি, একেবারেই ফুরিয়ে গেছি কিশা। একজন আমাকে কুরে কুরে খেয়ে গেছে।

কিশা ফিসফিস করে বলল, আমার কি জোর আছে ? আপনি জোর দিন আমায়।

অরি শুনতে পেলো না কিশা কি বলল। কিশার হাতটা নিয়ে নিজের মুখে কপালে বুলোল, তারপর চোখে।

কি করছে না জেনেই কিশা দুহাতে জড়িয়ে ধরল অরিকে। ওর বুকের মধ্যে টেনে নিলো অরির মাথা। দুহাতে ধরে রইল চেপে। আর মুখ রাখল অরির চুলের উপর।

অনেকক্ষণ ঐভাবে বসে রইল ওরা দুজনে। এক গভীর সখ্যতায়, উষ্ণতায়; নির্ভরতায়, যুগ্ম হয়ে।

কিশা হঠাৎ বলল, পিকুর কাছে শুনেছি একজনের কথা। আমাকে একবার তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। সেই নিষ্ঠুর, নীচ মহিলাকে আমার একবার দেখতে ইচ্ছে করে।

অরি বলল, ছিঃ ছিঃ, অমন করে বোলো না। ও যে বন্দী হয়ে গেছে। মুক্তি নেই ওর। তাছাড়া, নিষ্ঠুরতার কথাই যদি বলো, তো বলি, সব মেয়েই নিষ্ঠুর। তুমিও কি নও ?

কিশা বলল, মুক্তি নেই কেন ? মুক্তি যে চায়, সেই-ই মুক্তি পায়।

পায় না। মুক্তি চায় সকলেই। কিন্তু মুক্তির দাম দিতে রাজী থাকে না যে ! সে পায়নি; তুমিও পাবে না। রুমি এবং তুমি দুজনেই খাঁচায় আছো। আমি বনের পাখি, খাঁচার পাখিকে পাবো কি করে ?

ওরা দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে বাইরে চেয়ে রইল। একটা কোকিল পাগল হয়ে গেছে। ডাকতে লাগল অবিরাম। পাগলা কোকিলটা।

অরি বলল, সেই মেয়ের কথা থাক। তোমার কথা বলো। আমি যা চাই; সবই দিতে পারো তুমি ? তুমি তো আমাকে ভালোবাসো, তাই না ? কি করতে পারো তুমি আমার জন্যে ? কতটুকু ?

কিশা সোজা হয়ে বসে বলল, আমি তার মত নই। আপনি যা চান আমি সবই দিতে পারি আপনাকে; করতে পারি সবকিছুই। সবাই একরকম নয়। আপনি দেখবেন, আমি তার মত নই। আমি দুঃখ দেবো না আপনাকে। আমার অদেয় কিছুই নেই আপনাকে।

অরি হাসল।

কিশা অবাক হল। কিশা মনে মনে ভেবেছিল, অরি তাকে আদরে, তার ঘরে নিয়ে যাবে। কিশা তার জীবনে এই প্রথম উপযাচক হয়ে কোনো পুরুষের সামনে গভীর রাতে এত ঝুঁকি নিয়ে এসেছিল। আর অরি কি না হাসছে তার কথা শুনে ? বড়ই অপমানিত মনে হল নিজেকে কিশার। লোকটা বোকা। অদ্ভুত লোকটা।

কিশা বলল, আপনি হাসলেন যে ?

অরি বলল, এমনিই। তারপরই বলল, দেখি, এদিকে তাকাও তো, বলেই হঠাৎ দুহাতে ওর মুখ ধরে আবার ওর দুচোখে চুমু খেলো। ক্ষণিকের জন্যে মুখ রাখলো ওর স্তনসন্ধিতে।

কিশার শরীরে কালবৈশাখী উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ওর নাকের পাটা ফুলে উঠল, চোখ লাল হয়ে এল আবেশে।

হঠাৎ অরি বলল, ঘরে যাও কিশা। পিকু আছে। টুবুল আছে তোমার। তুমি আমার কেউ নও। কেউ হবে না কখনও। যাও, ঘরে যাও।

কিশা চেয়ার ছেড়ে অপমানে উঠে দাঁড়াল!

অরি বলল, শোনো, শোনো; ক্ষণিকের পাওয়া পেয়ে তোমাকে আমি চিরদিনের জন্যে হারাতে চাই না।

কিশা চলে গেল। যেতে যেতে ওর মনে হল, মানুষটা তাকে কী অপমানটাই না করল? উত্তেজনার টানা-পোড়েনে উঠতে নামতে লাগল ওর বুক দুটি। কিশা বড় বড় পা ফেলে গিয়ে, শব্দ করে দরজা বন্ধ করল ঘরের। যেন বন্ধ করল ওর শরীর মনের দরজাও।

অরি নিঃশব্দে হাসল।

অত জোর দরজা বন্ধ করার শব্দে পিকুর ঘুম ভেঙে গেল। বলল কে?

আমি।

কোথায় গেছিলে?

বারান্দায়।

—এত রাতে?

কিশা জবাব দিলো না।

—আরে! নাইটি পরলে কখন?

—দেখতেই তো পাচ্ছো, পরেছি।

—অরিদা ঘুমিয়ে পড়েছে? তুমি কি অরিদার কাছে গেছিলে?

—হ্যাঁ। গেছিলাম। তুমি আর কিছু বলবে?

—নাঃ। পারেনি তো? পারে না, ও পারবে না; আমি জানতাম। পিকু আর কোনো কথা বলল না।

কিশা টুবুলের পাশে শুয়ে দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বলল, পিকুই ঠিক বলেছিল। অরির সামর্থ্য নেই। ও পারে না, কিছুই পারে না। ও একটা যাচ্ছেতাই পুরুষ। বোকা, মেয়েলী, অপদার্থ একটা। খালি চোখে চুমু খায়, আগুন জ্বালিয়ে দেয়, কিন্তু আগুন নিভোতে জানে না। অসভ্য। ইউস্‌লেস রোম্যান্টিক ফুল একটা!

উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু

অরি বারান্দাতেই বসেছিল।

বাকি রাত তার একার!

রাত এখনও তরুণ। বাসি হয়নি কিছুই। বাসি হয়নি সে, কিশা, তাদের বোধ; কোনো

কিছুই। চাঁদ থাকতে থাকতেই পুবে সূর্য উঠবে। ঊষা আসবে। চাঁদ তাকে আপ্যায়ন করে বিদায় নেবে।

তখন চান করবে অরি!

মাঝে মাঝে এরকম সারা রাত একা একা জেগে কাটায় ও। যখন আর সকলেই ঘুমোয়, তখন একা জাগার মধ্যে একটা দারুণ মজা আছে। ভাবনাতে কোনো ছেদ পড়ে না। ভাবতে ভালো লাগে। ভাবতে ভাবতে কত কি অস্পষ্টতা কাটে। নিজেকে জানা হয়। পুরো নয়। পুরো কখনোই জানা যায় না। গীতায় বলেছে আত্মানং বিদ্ধি। সেটা একটা এ্যাবসুলুট ব্যাপার। তার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাঞ্জল করে বলেছেন, 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, ফুরাবে না, সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।'

কিশা খুব চটে গেছে। বেচারী! ভাবল, অরি।

বেচারী ও নিজেও। নিজের অসহায়তাতে যেমন ও কাঁদে শিশুর মত, মেয়েদের মত, তেমন মাঝে মাঝে হাসেও। ও একটা কমপ্লিকেটেড কেস। রুমি বলত। ঠিকই বলত! রুমির মত বুদ্ধিমতী মেয়ে খুব কমই দেখেছে। কিন্তু বুদ্ধি বেশী থাকলে প্রায়ই তা দুর্বুদ্ধি হয়ে দাঁড়ায়।

কিশাকে অরি সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছে। ও যে আবারও কাউকে ভালোবাসতে পারে, এই জানাটা জেনে ভালো লাগছে খুব। কিশাকে ও শারীরিকভাব কামনা করে না, করেনি যে তা নয়। একটু আগেও করেছে, একা ঘরে। ভীষণভাবে করেছে। কিশার যদি তার প্রতি কোনো শারীরিকভাব জেগেও থাকে তাহলে তা ওর নিজের ভাবের চেয়ে অনেক কম তীব্র। কিশা জানে না তা। তাই-ই ও ভুল বুঝে গেল।

ঠিক আর কে-ই বা বুঝল অরিকে?

কিন্তু আজ রাতে কিশাকে পেয়ে কি হত? অরি তো আর রমণীরমনের প্রতিযোগিতাতে নামেনি! এক টুকরো, এক রাতের কিশাকে নিয়ে ও কি করবে? অন্য কোনো পুরুষ হলে এই পাওয়াতে তার ইগোসট্যাটিস-ফ্যাকশান হতো হয়ত। কিন্তু অরির ইগো অত সস্তা নয়, সহজ নয়।

অরির মুখে এক স্মিত হাসি ফুটে উঠল।

অরি ভাবছিল, পুরো ব্যাপারটাই গোলমেলে করে গেলেন শ্বেতকেতু নামের এক ভদ্রলোক। শ্বেতকেতু উদ্দালকের ছেলে। শ্বেতকেতু সম্বন্ধে মহাভারতে (আদি ১২২ অঃ) এক কাহিনী আছে।

সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে অরির। কিশা এসেই সব গোলমাল করে দিল।

কিশা বারান্দাতে আসার আগের মুহূর্তেও শ্বেতকেতুর কথাই ভাবছিল ও। শ্বেতকেতুর আগে স্ত্রী-পুরুষের আনুষ্ঠানিক কোনো বিয়ের ব্যাপারই ছিলো না। তখনকার দিনে রুমি

কিশোরী কিশা কেউই এমন খাঁচার মধ্যে, অভ্যাস বিরক্তি এবং দৈনন্দিনতার একঘেয়েমির মধ্যে জীবন কাটা যেতো না। ইচ্ছে হলেই স্বৈরিণী হতে পারত। সমাজ তাদের সে স্বাধীনতা দিয়েছিল।

শ্বেতকেতুর বাবা ছিলেন উদ্দালক। শ্বেতকেতু যখন ছোট, তখন একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে শ্বেতকেতুর বাবার কাছ থেকে তার মাকে চেয়ে নিয়ে গেলেন। শ্বেতকেতু তাঁর বাবাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে উদ্দালক বললেন যে, তোমার মায়ের উপর তো আমার বিশেষ কোনো অধিকার নেই। সুতরাং যে কেউই তাকে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে সহবাস করতে পারে।

মা এই রকমভাবে ব্রাহ্মণের সঙ্গে চলে যাওয়াতে শ্বেতকেতু খুব চটে গেছিলেন। তিনি যখন বড় হলেন তখন তিনি স্ত্রী-পুরুষের বিয়ের প্রথার চল করলেন এবং স্ত্রী-জাতির সতীত্ব রক্ষার ব্যবস্থা করলেন।

এই শ্বেতকেতুই পরে নন্দীর হাজার অধ্যায়ের কামশাস্ত্রকে ছোট করে পাঁচশ অধ্যায়ের কামশাস্ত্র রচনা করেন। শ্বেতকেতু কাল্পনিক চরিত্র ছিলেন না। তৈত্তিরিয়সংহিতা, ছান্দোগ্যোপনিষৎ, এবং বৃহদারণ্যকোপনিষৎ-এ শ্বেতকেতু সম্বন্ধে আরও অনেক কাহিনী আছে।

সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এই-ই যে, স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার সুব্যবস্থা করার পরও এদেশে যত কামশাস্ত্র রচিত হল, তার প্রায় সমস্ত শাস্ত্রেই একটি করে অধ্যায় থাকলো, যার নাম : "পারদারিক।" বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রেও একটি বিশেষ অধ্যায় আছে, যার নাম "পরদারিকাধিকরণম্য।" মানে, পরস্ত্রীকে কিভাবে অধিকার করা যায় সেই শাস্ত্র। বিবাহিতা স্ত্রীদের সতীত্ব রক্ষার সুবব্যস্থা করে তারপরেই জ্ঞানীগুণীদের পক্ষে পরদারিকাধিকরণ সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণটা একটা দারুণ মজার ব্যাপার বলে মনে হয় অরির।

অরি ভাবছিল যে, তার কিশাকে ভালোবাসার মতন, পরস্ত্রীকে ভালোবাসাটা কিছু নতুন নয়। সামাজিক অপরাধও নয়। হলে, কাব্যে, সাহিত্যে, কামশাস্ত্রে; পরদার অনুপস্থিত থাকতো। পরকীয়া অস্বাভাবিকও নয়।

মনে হয়, প্রত্যেক বিবাহিতা মেয়েরই একটি খোলা বারান্দার প্রয়োজন আছে ও থাকে—যেখানে সে তার স্বামী ও সংসারের আবর্তে হাঁপিয়ে উঠে কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড়াতে পারে এসে। সেই খোলা হাওয়ায় নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করে আবার বদ্ধ ঘরে ফিরে যেতে পারে। ঘর যতখানি সত্য, বারান্দাও ততখানিই সত্য। যদি কোনো নারী বলেন যে, তাঁর মনকে তিনি ঘরের মধ্যেই আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছেন চিরদিন, তাহলে হয় তিনি সত্যি কথা বলেন না; নয়ত তিনি আত্মবঞ্চনাতে বিশ্বাস করেন।

কিশাকে অরি শুধুমাত্র এক রাতের জন্যেই চায়নি! চায় না।

অরি বড় যন্ত্রণার মধ্যে জেনেছে যে, কোনো পুরুষই এক বা একাধিক নারীর শরীর মনের ভালোবাসা ছাড়া বাঁচতে পারে না। তার অর্থ, বিদ্যা, যশ, তার যাবতীয় প্রাপ্তি বৃথা হয় জীবনে এক বা একাধিক নারী না থাকলে। সেই অস্নিগ্ধ বাঁচাকে বাঁচা বলে না। নারীহীন পুরুষ হয় যন্ত্র, নয় ভগবান। সেই ন্যুব্জ ও কুব্জ বাঁচাতে বিশ্বাস করে না অরি। নারী নইলে পুরুষ সার্থক হয় না; অনুপ্রাণিত হয় না।

কিশাকে ও চিরদিনের মতই চায়। অশেষ করে, প্রত্যহর জন্যে। অথচ প্রত্যহর গ্লানি লাগবে না তার গায়ে। শ্বেতকেতুর মাকে নিয়ে সেই ব্রাহ্মণ যেমন বুক ফুলিয়ে হেঁটে চলে গেছিলেন উদ্দালকের সামনে দিয়ে, সেইভাবেই পিকুর সামনে দিয়ে মাথা উঁচু করে হেঁটে যেতে চায় সে কিশার হাত ধরে। চুরি করে নয়, লুকিয়ে নয়, মিথ্যাচারে নয়, ও সোজাসুজি এ জীবনের মতো কিশাকে কেড়ে নিতে চায়।

রুমিকে দেখে অরি বুঝছে যে, ক্ষণিকের চুরির ধন থাকে না। থাকে না, চুরি করে আনা বা মিথ্যাচারের অর্থ কিংবা নারী। যা থাকে না, যা থাকার নয়, যা চাতুরী ও ছলের অন্ধকারে পেতে হয়; তা সে আর চায় না। রুমির জন্যে তার জীবনের অনেকখানিই নষ্ট হয়ে গেছে। রুমি খোলাখুলি মর্যাদা সম্পন্ন ব্যবহারে বিশ্বাস করেনি কখনও। সে তার স্বামীর আইনানুগ গণিকা। তেমনিই, আইনের চোখ এড়িয়ে গণিকাবৃত্তি করতে চেয়েছিল সে অরির সঙ্গে। অন্যের সঙ্গে। হয়ত সে এখনও করে তা।

রুমি, মূলতঃ অসৎ! গাছেরটা খেয়ে ও তলারটাও কুড়োতে চাইত। কিশাকে তা হতে দেবে না অরি। কিশাকে তার চাই-ই। সম্পূর্ণ নিটোল, অখণ্ড কিশাকে। চিরদিনের কিশাকে।

তার স্বামী পুত্রকে ফেলে যদি সে অরির কাছে আসতে পারে, তবে সে বুঝবে, কিশা তেমন করে ভালোবাসে অরিকে। সত্যিই অরিকে চায় সে। সিঁদেল চোরের মত, ছুঁচোর মত, রাতের ভীরু ধূর্ত শিয়ালের মত কিশার শরীর মনে দাঁত বসিয়ে ভোরের আলো ফোটার আগেই আড়াল খুঁজে লুকোতে চায় না অরি। তেমন প্রেমিক রুমি খোঁজে। সতীত্বের জয়ঢাক বাজিয়ে পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী হতে ভালোবাসে সে। রুমি খুঁজুক। রুমি রুমিই। তার চরিত্রের সঙ্গে মিল আছে এমন প্রেমিক সে পেয়ে গেছে, না পেলেও; পেয়ে যাবে সে। সে যার যোগ্য! যে যার যোগ্য!

কিশা! তুমি আমার। বাকি জীবনের জন্যে তুমি আমার।

মনে মনে অরি বলল।

কালিম্পং-এ জমি কিনে রেখেছে অরি। কিশার সঙ্গে বসে, কিশার প্ল্যান মত কটেজ বানাবে ও। দুটো কটেজ থাকবে। মধ্যে জাপানীজ গার্ডেন। ওর কটেজে থাকবে বই; শুধুই বই। কিশার কটেজ, কিশা যা যা ভালোবাসে।

আমনি পূর্ণিমার রাতে অভিসারে আসবে কিশা তার কাছে। অথবা ওই যাবে কিশার কাছে। ওদের দুই কটেজের মাঝে বিনি-সুতোর মালা ঝুলবে—ফুল শুধু ফুল। হোলির দিনে শিউলির বোঁটা দিয়ে রঙ তৈরী করে সেই রঙে হোলি খেলবে দুজনে। জলের মধ্যে শিউলি-রঙা ঠোঁট নিয়ে রাজহাঁস-হাঁসী ভেসে বেড়াবে। আতর-দেওয়া জলে চান করে বাগানে বসবে এসে অরি। কিশা আসবে ফুলের পোষাক পরে, ফুলের মুকুট মাথায়।

শুধুই ফুল আর হীরে। কোনো শাড়ি থাকবে না তার গায়ে। কোনো অন্তর্বাসও নয়। ফুলেই লজ্জা আর উত্তেজনা ঢেকে আসবে সে। চাঁদের আলোয় অরির লক্ষদীপা কিশা হীরেতে ঝিকমিক্ করবে। পাশে থাকবে বেলজিয়ান কাটগ্লাসের গুড়গুড়ি, গ্রীষ্মের পূর্ণিমাতে সেই গুড়গুড়ির নল হবে রুপোলী জরির— সে রঙ চাঁদের আলোর সঙ্গে মিশে যাবে। তাতেও থাকবে ফুলের সাজ। সোনার জল দেওয়া ঢাকনি থাকবে মাটির গাত্রে।

কিশা কোমর ঝুঁকিয়ে তার রেশমী চুলের ভার তার রেশমী নরম বুকে ফেলে, তামাক সেজে দেবে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে। খাম্বীরা তামাক। জটাবংশী, যষ্টিমধু, পামেলা, একাঙ্গী, জয়ত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, চুয়া আর চিনিরাব, এবং সবরী কলার সঙ্গে মেখে তৈরী হবে সেই তামাক।

কিশা গুন গুন করে গান গাইবে, পরজ বসন্ত রাগে। আর অরি গজদন্ত মিনারে বসা কোনো সম্রাটের মত তার স্বোপার্জিত, স্বিন্ন; যথার্থ গর্বের অর্থে তিল তিল করে উপভোগ করবে তার যৌবন, তার পৌরুষ, অক্ষম পরপুরুষের ঘর থেকে ছিনিয়ে আনা কিশাকে।

কারুকাজের দেওয়ালে বংশলতিকা ঝুলবে তার। কিশা-নাম্নী কুমারী নয়, সতীত্বহৃতা, পরদার, কামকলা-অভিজ্ঞা, অরি-কামা কিশার নাম ঝুলবে তার নামের পাশে মরকত মণির মণিহারে গাঁথা।

আসবে কিশা ?

তুমি আমার হবে চিরদিনের ?

তোমার টুবুলকে রেখে এসো পিকুর মূর্খ পিতৃত্বের গর্বের স্মারক হিসেবে। আমি তোমাকে নতুন জাতক দেবো। সাদা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে সে। হাতে থাকবে তার খোলা তরোয়াল, গায়ে থাকবে উষ্ণীষ, মাথায় থাকবে অজগরের মাথার মণি। মৃগয়া শেষে স্বেদাক্ত হয়ে ফিরে এসে সে ডাকবে, মা !

সে ডাকে বুক জুড়োবে তোমার। ছেলের মত ছেলে দেবো তোমাকে কিশা। ভীরু, চাকরিসর্বস্ব, কোনো বণিকের চাকর হবে না সে। সে এই দেশকে শাসন করবে। কিন্তু শোষণ করবে না। পিকুর মালিকের মত অনেক বণিককেই চাকর রাখবে সে ! রাখবে, পায়ের তলায়।

আসবে কিশা ?

অরি বলল, যেন কিশা তখনও পাশে বসে আছে। বলল, কোলকাতায় তোমাকে একটা সাদা গাড়ি কিনে দেবো আমি। ভীড়ের বাসে, রিকশায়, সর্বজন-ব্যবহৃত নোংরা ট্যাকসিতে উঠতে দেবো না তোমাকে। সাদা উর্দি পরা ড্রাইভার তোমার সাদা গাড়ি চালাবে। গয়নার দোকানে তোমার কখনও যেতে হবে না। যেতে হবে না শাড়ির দোকানেও। চুল বাঁধতে বা পা পরিষ্কার করতে, হাত-পায়ের লোম উঠাতে বা ভুঁরু তুলতেও তোমার যেতে হবে না কোথাওই।

তুমি নীলকমলের রঙের পাথরের বাথটাবে সুগন্ধি বাথসল্টের ফেনার মধ্যে শুয়ে হালকা-নীল টেলিফোনের ডায়াল ঘোরালেই ওরা সবাই ছুটে আসবে তোমার কাছে। কারণ তুমি অরির স্ত্রী।

বিয়ে ? বিয়ে তো সব পুরুষই করে।

তোমাকে যেমন করে রাখবে অরি, তেমন করে না রাখলে বিয়ে করা কিসের জন্যে ? পুরুষের সার্থকতা তো নারীর স্বাচ্ছন্দ্যেই ; তার যত্নেই। নারীকে তুলোর মধ্যে করে রাখারই জন্যে তো পুরুষের প্রয়োজন।

হ্যাঁ কিশা। আমি হয়ত শভিনিস্ট, অরি; ওনাসিস যেমন করে জ্যাক কেনেডীকে রেখেছিল, নিজের মালিকানায় আদিগন্তে গর্বের দ্বীপে, শুক্তির মধ্যে উজ্জ্বল মুক্তোর মত বসিয়ে; অরিও তোমাকে তেমন করেই রাখবে। তুমি জানবে তখন, এই জীবনের মানে কি ? একটাই তো জীবন। আমার এবং তোমার। এবং সকলের।

ঘর্মাক্ত পিকু অফিস থেকে ফিরে তার গলার দাসত্বর ফাঁস খুলতে খুলতে শূন্য ঘরে ডাকবে, কিশা ! কোথায় গেল কিশা ?

টুবুল স্কুল থেকে ফিরে, টালমাটাল পায়ে দৌড়ে এসে বলবে, মা ! মা তোথায় ?

তুমি কিন্তু ওদের ডাকে সাড়া দেবে না। তুমি অরি-ভোগ্যা।

একটাই জীবন কিশা। তোমার এবং আমার। মুক্তি যদি তেমন করে চাও—তো মুক্তি পাবেই ! বড় ত্যাগেই শুধু বড় পাওয়া ঘটে।

এসো, এসো, আমরা নতুন করে সব শুরু করি। ছেড়ে এসো ঐ মধ্যবিত্তর দমবন্ধ কর্তব্যর, সাধারণ্যর ঘর, ঐ ঘাম ; ঐ ক্লান্তি। ছিঁড়ে ফেলে দাও টুকরো করে, ভীরু সাবধানী মূর্খ শ্বেতকেতুর স্বেদের সনদ। এসো কিশা, আমরা দুজনে মিলে আমাদের শরীর আর মনকে একবার প্রাণ দিই, নতুন প্রাণ; মুক্তি দিই, ছুটি দিই এই জীবনে, এক জীবনে; সব সাধ মিটিয়ে নিই আমরা। এসো, মুগ্ধ প্রাণে, পূর্ণ প্রাণে, পরম প্রাণে বাঁচি আমরা। আমরা দুজনে বাঁচার মত বাঁচি। এই ভোগ্যা পৃথিবীকে নিংড়ে নিয়ে ভোগ করি। আমরা উলিসিসের মত বলি, এসো, 'লেট আস্ ড্রিংক লাইফ টু দা লীজ্।'

উদ্দালক, সরী, পিকু ; আমার নাম অরি। অরি ব্যানার্জি। আমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে

যাচ্ছি। তোমার সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বাকি জীবন সে আমারই সহচরী। কর্মের নয়, শুধুই নর্ম-সহচরী। আমার সঙ্গেই শুধু তার অনির্বাণ সহবাস।

কি দিয়েছো তুমি কিশাকে ? নারীতে তোমার কোনো অধিকার নেই। কিশাকে কি করে রাখতে হয়, ভালোবাসতে হয়, একদিন এসে দেখে যাও। তুমি তোমার যোগ্য কোনো নারীর খোঁজ করে নাও। তোমার যোগ্য নারী অনেকই পাবে। রুমি যেমন পেয়ে গেছে তার যোগ্য পুরুষ, বিবাহে এবং পরকীয়ায়। শোনো পিকু, নারী অনেকই পাবে; কিন্তু কিশাকে তুমি আর পাবে না।

কিশা আমার।

আমার চিরকালের।

কি বললে ? উদ্দালক, পিকু; তুমি কি বললে ?

যদি কেউ আমার কাছ থেকেও ছিনিয়ে নেয় কিশাকে তাহলে কি করব আমি ?

নিশ্চয়ই তোমার মত পা-ছড়িয়ে কাঁদতে বসবো না। বিরহের কবিতা লিখব না, স্লোগান দেবো না; 'বুর্জোয়া অরি নিপাত যাও' বলে। আমি পৈতৃক সম্পদে বিত্তবান নই, আমি স্বয়ম্ভু; আমার গর্ব যথার্থ। তোমরা নিজেরা কৃতবিদ্য নও বলে, যোগ্য নও বলে; ভিখিরী বলেই যার কিছুমাত্রই আছে তাকে তোমরা ঈর্ষার রসাতলে পাঠাও।

কি করব জানো পিকু ? আমি হাসতে হাসতে ছেড়ে দেবো কিশাকে। কারণ যে পুরুষ, সত্যিকারের পুরুষ, সে নারীর শোকে কখনই কাঁদে না। তার আড়ম্বরের, তার উড়াল মনের, তার কেশরী শরীরের, নারী এক আভরণ, আবরণ মাত্র। নারী আসে, নারী যায়; তারা জলেরই মত। জলেরই মত তাদের মতি, গতি এবং রতি ! যেদিকে ঢাল, সেদিকেই গড়ায়।

কি বললে পিকু ? তাই যদি হবে, তবে রুমিকে ভুলতে পারিনি কেন ? সেই জলের মত নারী কেন চোখের জলেই বাসা বেঁধেছে আমার ?

চুপ করো ! চুপ করো। একদম চুপ করো পিকু। আমি এক দারুণ ঘনঘোর স্বপ্নে আছি। স্বপ্ন, সব স্বপ্ন; এই রুপোঝুরি উড়াল রাতে, উদ্বেল সুগন্ধে, এই ভালোলাগায় আমার স্বপ্ন ভাঙিও না কেউ। দয়া করো পিকু।

আমাকে দয়া করো। স্বপ্নের মধ্যে কিছুক্ষণ বাঁচতে দাও আমাকে।

সকালবেলায়

ভোর হবার আগেই স্নান সেরে হাঁটতে বেরিয়েছিল অরি।

দারুণ লাগছিল। এখন না-রোদ, না-ছায়া; না-গরম, না-ঠাণ্ডা। ভোরের পাখি ডাকাডাকি করছিল, ঝাঁপাঝাঁপি করছিল আধ-জাগা গাছে গাছে। ঘুমজাগানো মিষ্টি হাওয়া বইছিল গায়ে পুলক লাগিয়ে। রুমি একটি গান গাইত 'বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া'।

গানটা মনে পড়ল।

বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল।

বুক থাকলেই মাঝে মধ্যে এরকম করে।

দুটি বাচ্চা ছেলে মোষের পিঠে চড়ে চলেছে পাহাড়ের আঁচলের দিকে।

এক ঝাঁক টিয়া উৎক্ষিপ্ত সবুজ সবুজ ক্ষুদে জেট প্লেনের মত আধো জাগা, অপ্রস্তুত আড়মোড়া ভাঙা আকাশকে হঠাৎ চিরে দিয়ে চলে গেল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল অরি সেইদিকে। চুপ করে থাকল।

ঝিরঝির করে হাওয়া বইছে। রুমি একটা গান গাইত 'বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া।"

গানটা আবারও মনে পড়ল।

রুমিকে আর মনে করতে চায় না অরি। কিশা। আঃ কিশা।

কাল কি হয়েছিল অরির ? কত কি আবোল তাবোল ভাবল সারারাত। মানুষ বোধহয় এমনি করেই পাগল হয়। পিকু বোধ হয় ঠিকই বলে। ও পাগল। মাঝে মাঝে লুসিড ইন্টারভ্যালেই ও শুধু সুস্থতা পায়। সত্যিই পাগল।

কোথায় যেন পড়েছিল অরি, 'স্বপ্নেই যদি পোলাউ রাঁধছ, তবে ঘি ঢালতে কঞ্জুষী করছ কেন।' মুজতবা আলী সাহেবের কোনো বইয়ে কি ? ঠিক, ঠিক। মনে পড়েছে।

কাল রাতে কঞ্জুষী তো করেই নি, উল্টো স্বপ্নের পোলাউতে ঘিয়ের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল।

বাংলোটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। বারান্দায় চেয়ারে বসে আছে পিকু। পিকুর পাশে কিশা। সিঁড়ির সামনে হলুদ লাল ঝরাপাতা নিয়ে খেলছে টুবুল। একেই বুঝি বলে, আদর্শ সুখী পরিবার। অরি নিজের চোখ দুটোকে একটা টেলি-লেন্স করে নিয়ে, পৌঁছে গেলো একেবারে বারান্দায়। দেখল, কিশার চুল এলোমেলো, চোখ লাল; বোধ হয় ঘুমোয়নি রাতে।

কিশা তারই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পিকু উদাসীন চোখে দূরে চেয়ে সিগারেট খাচ্ছে। পিকু নিশ্চল থাকতে পারে না।

অরি এগোলো। কাছে যেতেই দেখল, ওর গাড়ির পিছনের বাঁদিকের টায়ারটা বসে গেছে। স্টেপনিটার কি অবস্থা, কে জানে ?

পিকু বলল, এসো, এসো। কোথায় গেছিলে ?

এই ! একটু হেঁটে এলাম।

বারান্দায় ওঠার আগে টুবুলকে ঘাড়ে চড়িয়ে দুবার ঘুরপাক খাইয়ে দিল অরি।

টুবুলের হাতে একটা খেলার পিস্তল ছিল।

অরি বলল, তুমি কে গো ? অরণ্যদেব ?

টুবুল বলল, না। আমি ফ্যান্‌তাম্‌।

অরি আবার ওকে আদর করল।

টুবুলকে কত সহজে জড়িয়ে ধরা যায়, আদর করা যায়, কিন্তু কিশাকে যায় না। বড় কষ্ট!

কিশা বলল, চা খাবেন অরিদা!

অরি বলল, তুমি দিলে বিষও খাবো।

কিশা হাসল। বলল, ঐ! আরম্ভ হলো? ভোরবেলা থেকেই!

পুরো পোশাকে আছে কিশা। কাল রাতের মত নয়। কালকের কিশা কি সত্যি? না স্বপ্ন? অলক উড়ছে কপালে, গালে। চা ঢালছে কেটলী থেকে। অরি লক্ষ্য করল, ওর হাতটি, আঙ্গুলগুলি কি সুন্দর! কি সুন্দর করে চামচ নাড়াচ্ছে কাপে চিনি দিয়ে। আঃ। কিশার সব সুন্দর।

পিকু বলল, সরি, অরিদা কাল রাতের জন্যে। তুমি কিছু মনে করোনি তো? পার্ডন্‌ মি প্লীজ!

অরি বলল, কি মনে করব? দোষ তো আমারই। কিশা তো যেতেই চায়নি, আমিই জোর করে নিয়ে গেছিলাম ঘাটে।

কিশা একবার তাকাল চকিতে মুখ তুলে অরির দিকে!

কথা বলল না কোনো।

অরি বলল, কালকের কথা ছাড়ো তো! এবার বলো, প্রোগ্রাম কি?

এই জায়গাটা পছন্দ? অরি শুধোল!

দা—রু—ণ। পিকু বলল।

তাহলে এখানেই থাকা যাক। চান সেরে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে নাও। চলো, বেরোই আমরা। গরুমহিষিণী ঘুরে আসি। সেখানে আমার একটু কাজও আছে। পাঁচ মিনিটের। আমি কখনও যাইনি জায়গাটাতে।

তারপর বলল, কখনও লোহার খনি দেখেছ?

না। পিকু বলল।

কিশা চুপ করেই চায়ের কাপটা এগিয়ে দিল অরির দিকে। চিজলেটের প্যাকেট থেকে কিছুটা চিজলেট ঢেলে দিল।

অরি বলল, আমি চাকাটা ততক্ষণে বদলে নিই।

পিকু বলল, তুমি তো চান করে ফেলেছো। নোংরা হবে কেন? আমিই বদলে দিচ্ছি। বড়মামার গাড়ির চাকা বদলে বদলে এক্সপার্ট হয়ে গেছি। আমি ছোটবেলা থেকে চাকা বদলাতেই পারি। নিজের গাড়ি থাক আর না-ই থাক।—

অরি হাসল। বলল, গাড়ি চালাতে জানো, চাকা বদলাতে জানো, এখন গাড়ি একটা কিনে ফেলো।

কিশা বলল, নিজের গাড়ি আর কি করে হবে ? কোনো এ্যাম্‌বিশানই নেই। একটু খেটেই তো কাত। খালি আড্ডা ; বন্ধু বান্ধব। সত্যি ! পরের গাড়িতে এমন করে বেড়াতে আমার ভাল লাগে না।

অরি, এবং পিকুও চমকে চোখ তুলল কিশার দিকে।

কিশা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলো।

অরি বলল, হবে হবে, পিকুর গাড়ি হবে। আপাততঃ মনে করো না কেন তোমরা ভাড়া গাড়ি করেই বেড়াতে বেরিয়েছ। আমি তো পরই। সে তো জানিই আমি। বারবার নাই-ই বা বললে সে কথা।

কিশা চোখ তুলে বলল, ভাড়া করা গাড়ি ? বলেন কি ? ভাড়া কত হবে ? ভাড়া গুণতে তো সর্বস্বান্ত হতে হবে দেখছি !

অরি চায়ের কাপ মুখে তুলতে তুলতে বলল, তুমি যদি একবার আমার দিকে চেয়ে হাসো তাহলেই সব শোধ। তাছাড়া, তুমি যে এত সহজে সর্বস্বান্ত হতে পারো, তা জানা ছিলো না আমার।

পিকুও হাসল।

কিশা হাসল না।

বলল, জীবনে সব কিছুই একবার হেসেই পাওয়া গেলে, দুঃখই ছিল না কোনো।

অরির ঠোঁটের কোণায় হাসি লেগেছিল এক ফালি। বলল, সবারই তো এমন হাসি নেই, তোমার মত। যাদের আছে; তারা হয়ত একবার হেসেই পায়।

পিকু বলল, অরিদা তুমি তো নতুন গাড়ি নিচ্ছোই। তোমার এই গাড়িটা রিটন্-ডাউন ভ্যালুতে বিক্রী করে দাও আমাকে। ইনস্টলমেন্টে দাম দেবো। কত পড়বে ?

অরি বলল, রিটন্-ডাউন ভ্যালুতে আর কত পড়বে ? পঁচিশ হাজার মত।

পঁ-চি-শ হাজার ! পিকু লাফিয়ে উঠল।

কিন্তু পরক্ষণেই বলল, ওক্কে ! দশ বছরে তোমাকে শোধ করে দেবো। মান্থলি ইনস্টলমেন্টে। দেবে ?

অরি বলল, দেবো। এখন থেকেই মনে করো যে, গাড়িটা তোমারই ! আমিই এ কদিন পরের গাড়ি চড়ে সুখ করে নিই। এবং যেহেতু গাড়িটা নিজেরই হয়ে গেল, এবারে চাকাটা বদলে ফেলো লক্ষ্মী ছেলের মতন।

পিকু হাসল।

কিশা বলল, চাকা বদলাবে ঠিকই। কিন্তু গাড়ি ওকে আমি নিতে দেবো না।

কেন ? পিকু বলল।

এমনি কত দাম হবে গাড়িটার ? কিশা অরিকে জিগগেস করল, বাজার দর ?

পঞ্চাশ হাজার। নতুন গাড়ির দাম এখন আশি হাজার।

পঞ্চাশ মাইনাস পঁচিশ। পঁচিশ ! তার মানে পঁচিশ হাজার টাকা সস্তা করেছেন আপনি পিকুকে ? ফেভার করছেন ? কিন্তু কেন ?

পিকু বলল, ফেভারের কথাই যদি বলো, তাহলে ইন্টারেস্টটাও ধরো। প্রায় তিরিশ মত চলে যাবে ফিগারটা সব নিয়ে।

ইমপসিবল্। কিশা বলল। গাড়ি নেবে না পিকু।

কেন ? অরি বলল। অবাক গলায় বলল, তোমার এত আপত্তি কেন ? আমি তো পিকুকেই দিচ্ছি। তোমাকে তো দিচ্ছি না।

ওটা যেন মনে থাকে। কিশা বলল। এমনি সম্পর্কই ভালো। টাকা-পয়সা লেন-দেন সম্পর্ক খারাপ করে। তাছাড়া, ফেভার দিলেই মানুষ বদলে প্রত্যাশা করে। সব মানুষই করে। বদলে কিছুই দিতে পারব না কিন্তু। আগেই বলে দিচ্ছি !

পিকু কিশাকে থামিয়ে দিয়ে সিরিয়াস গলায় বলল, গাড়িটা এক্ষুনি দিয়ে দিলে তোমার চলবে কি করে অরিদা ?

হ্যাঁ। আমি তো নবাবের ছেলে, নবাবই। ট্রাম-বাস মিনিবাস কিছুই তো নেই কোলকাতায়।

একটু চুপ করে বলল, ফিরেই বোম্বে যাচ্ছি কাজে। সেখান থেকে ফিরব দশদিন বাদে। ততদিন নতুন গাড়ি এসে যাবে। এ্যালটমেন্ট লেটার পেয়ে গেছি। যদি কিশা অনুমতি করে, তাহলে নিতে পারো।

কিশা কথার পিঠে বলল, গাড়ির এত দাম তবুও ঘন ঘন গাড়ি বদলান কেন ? আপনার বুঝি একই জিনিস ভালো লাগে না বেশীদিন ? সব কিছুই পুরোনো হয়ে যায় তাড়াতাড়ি ? শেষের কথাকটি, সোজা অরির চোখে তাকিয়ে বলল।

অরি খোঁচাটা এড়িয়ে গেল। বলল, ইনকাম ট্যাকসে ছাড় পাই। ডিপ্রিসিয়েশান পাই তো। আর তাড়াতাড়ি গাড়ি বিক্রি করলে রিপেয়ারিং-এর খরচাও থাকেই না বলতে গেলে।

ঠিক বলেছো। পিকু বলল। তারপর বলল, তোমার গাড়ির কন্ডিশান কিন্তু খুব ভালো।

মালিকেরও। কিশা ফোড়ন কেটে বলল।

টুবুল দুম্ দুম্ করে পিস্তল বাগিয়ে ধরে আওয়াজ করল দু-তিনবার। বেশ দূরে চলে গেছে ও। লক্ষ্য করেনি ওরা কেউই।

টুবুল চেঁচিয়ে বলল, থাপ মেরেছি, থাপ। মা, থাপ মেরেছি।

পিকু আর অরি মনোযোগ দেয়নি টুবুলের কথাটাতে, কিন্তু কিশা উঠে তাকাল টুবুলের দিকে। তাকিয়েই চিৎকার করল, সাপ ! সাপ !

সত্যিই তো সাপ ! চাঁপা গাছটা ফুলে ভরে আছে, তার নীচে একটা কালো রঙের প্রকাণ্ড বড় সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝরে-পড়া চাঁপার হলুদ গালচেতে শুয়ে টুবুলের দিকে ফণা তুলেছে। প্রকাণ্ড চওড়া ফণা।

কিশা হাঁউ-মাঁউ করে কেঁদে উঠলো। মার কান্না দেখে টুবুল ভয় পেয়ে এদিকে দৌড়ে আসতে যাচ্ছিল।

অরি জোরে বলল, টুবুল ! দৌড়িও না। দাঁড়িয়ে থাকো। আমি যাচ্ছি।

অরি দৌড়ে গেল টুবুলের দিকে, গিয়েই ওকে কোলে তুলে নিয়ে এক দৌড়ে ফিরে এল।

ততক্ষণ পিকু আর কিশা সিঁড়িতে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

সাপটা এবারে কুণ্ডলী খুলতে লেগেছে।

অরি স্বগতোক্তি করল, এত বড় সাপ, বাংলোর এত কাছে ?

টিব্বা সিং দৌড়ে এল।

অরি জিজ্ঞেস করল ওকে, বাস্তু সাপ নাকি ? মারবে না একে ?

টিব্বা সিং বলল, না বাবু, বাস্তু সাপ-টাপ নয়। কখনও দেখিনি এর আগে। সাংঘাতিক সাপ।

অত বড় ফণা তোলা সাপকে লাঠি দিয়ে মারা যাবে না। ভাবল অরি ! সাহসও হলো না। লাঠি দিয়ে সাপ মারার কায়দা আছে। লাঠি শুইয়ে মারতে হয়। শুনেছে। কখনও পরীক্ষা করে দেখেনি।

টিব্বা সিং বলল, বড় মুশকিল।

পিকু গাড়ির চাবিটা অরির কাছ থেকে চেয়ে নিয়েই দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে বসে ফ্ল্যাট টায়ার শুদ্ধুই গাড়ি স্টার্ট করল। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে সাপটা উত্তেজিত হয়ে ফণাটা আরো উপরে তুলল। চেরা-জিভটা লক্-লক্ করতে লাগল। নিমগাছে কাকগুলো কা খা কা খা করে উঠল। কিশা টুবুলকে জড়িয়ে ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল, অরির গা ঘেঁষে।

এঞ্জিন ভালো করে রেস্ করল। জানালার সব কাঁচ তোলাই ছিল। চাঁপা গাছটার দিকে গাড়ি চালিয়ে দিল পিকু। সাপটা আক্রমণ করার জন্যে হিস্ হিস্ করে ফণা তুলল প্রায় কোমর সমান। কিশা চেঁচিয়ে উঠল। গাড়িটা কাছে পৌঁছতেই সামনের চকচকে বাম্পারের উপরে জোরে আছড়ে পড়ে ছোবল মারল সাপটা।

গাড়িটা অনেকটা ব্যাক করে নিল পিকু। ততক্ষণে সাপটা চাঁপা গাছের তলা ছেড়ে বাইরে ফাঁকা জায়গায় জোরে এগিয়ে আসছে। এবারে গাড়ি সেকেণ্ড গিয়ারে দিয়ে, সাপের

দিকে জোরে গাড়ি ছোটাল ও ! এঞ্জিন গোঁ গোঁ করে উঠল প্রতিবাদে। সাপটার কোমরের উপর দিয়ে চাকাটা চলে গেল। এত জোর টায়ারে ছোবল মারল সাপটা যে, চাকাটা দুলে উঠল।

গাড়িটা ব্যাক করতেই দেখা গেল কোমর-ভাঙা অবস্থাতেই ফণাটা সোজা উপরে ফুলে ফেঁপে আক্রোশে ফুঁসছে সাপটা। ফণাটা যে কতখানি চওড়া হয়ে যেতে পারে না দেখলে বিশ্বাস করতো না কেউই।

এবারে সাপের মাথা লক্ষ্য করে আবারও গাড়ি চালিয়ে দিল পিকু। এবার চাকার তলায় চাকাটা প্যাতপেতে শব্দ করেই সাপের মাথাটা রাবারের মত লাফিয়ে উঠেই নেতিয়ে গেল বুঝতে পারল পিকু।

কিশা চেঁচিয়ে উঠল, মরেছে মরেছে। কিন্তু সাপ মরলেও তার শরীর নড়ছে; নড়বে অনেকক্ষণ।

আশেপাশের লোকজন সব ছুটে এল। ধপাধপ্ করে লাঠি পড়ল তখন তার উপর। হৈ হৈ পড়ে গেল। এত বড় সাপ!

টিব্বা সিং বলল, কাল বাংলোর গেটের কাছেই, অরিরা এসে পৌঁছবার একটু আগে পথের সামনের পুকুরে জল নিতে-আসা একটি মেয়েকে সাপে কামড়েছিলো! সাপটাকে কেউই দেখেনি। মেয়েটিকে ঝাড়ফুকুরিয়াতে ঝাড়ফুঁকের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু কাল রাতেই সে মারা গেছে।

টুবুলের চোখ বড় বড়। কিশার গাল চোখের জলে ভিজে গেছে। টুবুলের গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে আছে ও।

অরি বলল, ওয়েল ডান, পিকু।

পিকু অভিনন্দনের উত্তর না দিয়ে টিব্বা সিংকে বলল, বিয়ার-টিয়ার পাওয়া যাবে এখানে ?

না বাবু, বারিপাদা নয়ত রাইরাংপুরে যেতে হবে।

ধুস্স্স্। ভাবলাম, সাপ মারাটা সেলিব্রেট করব।

টিব্বা সিং কিছু বুঝল না।

যারা সাপটাকে টেনে নিয়ে যাবে গ্রামে তাদের তোড়জোড় দেখতে চলে গেল সে। যাবার সময় বলে গেল, পরোটা আলুর তরকারি, আর ডিমভাজা হবে নাস্তাতে। মাউসী তোড়জোড় করছে।

ওরা তিনজনে আবার এসে বসলো বারান্দায়। অরি টুবুলকে একটা ক্যাডব্যারি এনে দিল।

কিশা বলল, তুমি কি করে দেখলে সাপটাকে টুবুল ?

আমি তো অরণ্যদেব—না, না, ফ্যানতাম্। থিকার করতে গিয়ে তেখতাম থাপটাকে। টুবুল বলল।

কিশা আবার আদর করল টুবুলকে। তারপর অরির দিকে ফিরে বলল, কী সাহস আমার ছেলের। দেখেছেন!

বাবার সাহসও কম নয়। অরি বলল। লাইক ফাদার, লাইক সান। কিরকম বুদ্ধি করে অতবড় সাপটাকে মারল। একবার কামড়ালে কারোই রক্ষা ছিলো না। শুনলে তো, কাল সন্ধ্যের মেয়েটির কথা। ঝাড়ফুকুরিয়াতে ঝাড়ফুঁক্ করেও কিছু হলো না।

পিকু বলল, ঝাড়ফুকুরিয়া নামটা কি ঝাড়ফুঁক থেকেই এসেছে?

কে জানে? অরি বলল।

কিশা আবার চা ঢেলে দিল ওদের। উত্তেজনাকর কিছু ঘটার আগে এবং পরে বাঙালীমাত্রই চা খায়। ওরাও খেলো।

চুপচাপ বসে আছে এখন তিনজন। কিশা টুবুলকে বারান্দা থেকে আর নামতে দেয়নি।

অনেকক্ষণ পর পিকু বলল, কাল সন্ধ্যেবেলায় যখন আমরা বসেছিলাম, সাপটা তাহলে তখনও চাঁপা গাছের নীচেই ছিল! ওরা গন্ধ ভালোবাসে তাই না?

অরি বলল, ফুলের বনে সাপ তো থাকবেই। ফুল থাকলেই সাপ থাকে। সাপ বড় রসিক। সুগন্ধ ভালোবাসে, গান ভালোবাসে, বাঁশি ভালোবাসে।

পিকু বলল, গান-পাগল, গন্ধ-গোকুল; তোমারই মত।

তারপরই বলল, সাবধানে থেকো অরিদা। ফুলের বনেই সাপ থাকে। সাপ থাকলেই ফণা থাকে। ফণা থাকলেই বিষ থাকে।

অরি ঠাট্টার গলায়, হালকা করে কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলল, তা কি করা যাবে! যে, ফুল তুলতে যায়, তার সাপের ভয় পেলে চলে না!

কিশা বলল,, চা নিন অরিদা, এই যে!

চায়ের কাপটা হাতে ধরে রইল অরি। চা খেতে ইচ্ছে করছে না ওর। এই দৃঢ়বন্ধ ঘন-সন্নিবিষ্ট মা-বাবা-ছেলে; শ্বেতকেতুর দাবার গুটিদের মধ্যে বসে ওর হঠাৎই মনে হল এখানে ওর কোনোই শিকড় নেই। কোথাওই নেই। জীবনের চল্লিশটি বছর শুধু কাজই করেছে। নিজের দিকে তাকাবার সময় পায়নি। যাকে ভালোবেসে জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়টুকু, সবচেয়ে মহার্ঘ দান, যৌবন নিবেদন করেছে; সে জীবনের সাঁঝবেলাতে জানিয়ে দিয়েছে যে, সে তার কেউই নয়। অরির বেলা গেছে।

কিশাও তার কেউ নয়।

মিছিমিছিই পরকে ভালোবাসা, পর এবং পরদারের আনন্দ বিধান করা, পরস্ত্রীর মুখে হাসি-ফোটানোর এই ছেলেখেলা। শুধুই একজন অতি রমণীয় নরম নারীর তোলা-তোলা

সাধে ভরে না ক্লান্ত মন ; শ্রান্ত শরীর। অরির জীবনে এমন কেউই নেই, যাকে সে সত্যিই নিজের বলে দাবি করতে পারে। যাকে বকতে পারে, যাকে সমাজের চোখে আপনার বলে অধিকার করে সেই অধিকার নিয়ে গর্ব করতে পারে। যাকে পিকুর মত চেঁচিয়ে না হলেও বলতে পারে, তুমি আমার বিয়ে-করা বউ।

কিশা ওর কেউ নয়। কেউ নয়। শুধু দারুণ দিঠি, মুখের হাসি, চোখের চোরা-চুমু নিয়েই একজন মানুষ কী বাঁচে ?

অরি কাল চাঁদের রাতে মনে করেছিল, ভুল করে যে, কিশা তাকে ভালোবাসে। একদিন এমন এমনই ভুল করে মনে করেছিল যে, রুমিও তাকে ভালোবাসে।

রাত মাত্রই মোহময়ী, আচ্ছন্ন ! যা সত্যি নয়, যা অলীক, তাকেই তখনকার মত সত্য বলে মনে হয় রাতে। চাঁদনী রাতে শুধু ফুলভারাবনত চাঁপা গাছই নজরে আসে, তার নীচের কুণ্ডলীপাকানো বিষধর সাপকে দেখা যায় না তখন। সকালের আলো, সকালের সংস্কার এবং সংসারে আবদ্ধ, প্রোথিতশিকড় কিশা তাকে সব কিছু প্রাঞ্জল করে বুঝিয়েছে। মিছামিছি নিজে হাতে গাড়ি চালিয়ে, কিশাকে, পিকুকে, টুবুলকে নিয়ে সে এতদূর এলো। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আগামীকাল রাতে ওরা ওদের বাড়ির দরজায় নেমে যাবে।

বলবে, থ্যাংক ইউ ! গুড নাইট !

আবার সেই একা ঘর। একা থাকা, একা ভাবা, দমবন্ধ একাকিত্ব আবার তার গলা টিপে ধরবে। ওরা কেউ নয় ; কেউ নয়। কেউই অরির কেউ নয়। ও নিজেই শুধু ওর।

কিশা বলল, চা খাচ্ছেন না ? খারাপ হয়েছে ?

তারপরই বলল, কাল ঠকিয়ে দিয়েছে আপনাকে দোকানী। চা-টা ভালো ছিল না।

অরি ভাবল বলে, কেউ ঠকায় ; আর কেউ ঠকে এই চলেছে অনন্তকল ধরে। দোকানীর দোষ কি ?

কিন্তু মুখে কিছুই বলল না।

কিশা বলল, কি হল আবার আপনার ? ভাবছেন কি ? চা-টা খাওয়াই যাচ্ছে না ?

পিকু কবিত্ব করে বলল, ভাবুক লোকের ভাবনা মৌচাকের মত। ঢিল মেরো না। পিলপিল করে ভাবনার মৌমাছি বেরিয়ে হুল ফোটাবে তোমাকে। ভাবুককে একা ভাবতে দেওয়াই সেফ্।

অরি হাসবার চেষ্টা করল। করেই বুঝল, বোকার মত দেখালো হাসিটা।

বলল, না, না ; চা খুব ভালোই হয়েছে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম ! এই...

পিকু বলল, আমি ততক্ষণে চানটা সেরে ফেলি—যতক্ষণ তুমি অন্যমনস্ক থাকো। কি বল অরিদা ?

অরি কিছু বলল না।

পিকু চলে গেলে কিশা বলল, হঠাৎ বিতৃষ্ণা হ'ল কেন ? আমাদের কি খুবই খারাপ লাগছে ? তাহলে বলুন এখনই ফিরে যাই।

না; তা নয়। বলেই, চুপ করে গেল অরি।

কিশা একদৃষ্টে চেয়ে রইল অরির মুখে।

টুবুল বারান্দার এক কোণায় কতগুলো পাথর আর ঝরাপাতা নিয়ে খেলছিল নিজের মনে। কিশা একবার ওর দিকে তাকাল। তারপর উঠে গেল ঘরে। ড্রেসিং রুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে পিকু বাথরুমে চলে গেছে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে এসে বলল, অরিদা আপনার জন্যে মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয়। আবার পরমুহূর্তেই রাগও হয় ভীষণ। মাঝে মাঝে মনে হয়, আপনার দুঃখের ভার যদি কিছুটা হালকা করতে পারতাম। তারপরই মনে হয় যে, যদি না কেউ তার ভার তুলে দিতে রাজী থাকে অন্যের হাতে, অন্যের উপর নির্ভর না করে একটুও, অন্যকে আপন না ভাবে; তাহলে কেই-বা কি করতে পারে তার জন্যে ?

একটু থেমে আবার বলল, আপনার দুঃখের অনেকখানিই কিন্তু আপনারই তৈরী করা। হয়ত পুরুষমানুষদের পিকুর মতই হওয়াই ভালো। বহিরঙ্গ, একস্ট্রোভার্ট। এত গভীর যে হয়, তাকে দুঃখ পেতেই হয়; তার উপায় নেই। দুঃখবোধ, গভীরতা এসব যার নেই; সেই-ই বেশ থাকে।

অরি বলল, ঠিকই বলছো তুমি।

তারপর গলা পরিষ্কার করে বলল, কিছু মনে কোরো না। আমার স্বভাবটাই এরকম। অনেকের মধ্যে থেকেও মাঝে মাঝেই আমি একলা হয়ে পড়ি। অনেক দূরে চলে যাই। সেই দূরত্ব সম্বন্ধেও আমার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, থাকে না। সেই দূরত্বের শেষেও নতুন কিছু দেখতে পাই না। আমার মনের দিগন্ত কেবলই সরে সরে যায় আমার এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে ! কাছ থেকে দূরেই যাই শুধু মনে মনে—তাবার কোনো আশ্রয় না পেয়ে, গন্তব্য না-থাকায়; ফিরে আসি, যেখানে ছিলাম সেখানেই।

কিশা বলল, এরকম মনমরা হয়ে থাকলে আমার বুঝি ভালো লাগে ? আপনার জন্যে কিছুই কি আমি করতে পারি না ? এই যে, তাকান একটু আমার দিকে।

অরি কিশার দিকে তাকাল। তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল।

বলল, তোমার দিকে তাকাতে বোলো না। আমার বড় কষ্ট হয়। কি হবে তাকিয়ে ? তোমাকে, তোমাকে...।

কিশা মুখ নীচু করে রইল।

অস্ফুটে বলল, আমি জানি। কিন্তু কি করব বলুন ? কি করতে বলেন আপনি। আপনিই বলুন ?

অরি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না না, কিছুই করতে বলি না। তুমি কত সুখী। তোমার স্বামী, তোমার এমন মিষ্টি ছেলে, সুখের সংসার—আমাকে তুমি তোমার জীবনের মধ্যে টেনো না কখনো। আমাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিও। আমার দুঃখ তো আছেই। তোমার এত সুখের মধ্যে আমার হতভাগ্য জীবন জড়িয়ে কোনো লাভ নেই। তোমার সরল জীবনকে কেন মিছিমিছি কমপ্লিকেটেড করবে ?

আমার সুখ কী দেখেছেন আপনি ?

দেখছি, দেখছি কিশা। কাল অন্যরকম ভেবেছিলাম। আসলে আজ সকালে বুঝতে পারছি তুমি কত সুখী। এই সংসারে তোমার ভূমিকা কত বড়। কেন্দ্রস্থলে বসে তুমি সব কিছুকে তোমার সুন্দর হাতে ধরে রেখেছো। নিয়ন্ত্রিত করছ। তুমি নিজেই কেন্দ্রচ্যুত হলেই পিকু আর টুবুল হারিয়ে যাবে। আমার জন্যে তোমার নিজের ও ওদের এতবড় সর্বনাশ করতে কখনোই বলতে পারি না আমি। আমি দুঃখী হতে পারি—সুখের কাঙাল আমি, কাঙাল ভালো ব্যবহারের, ভালোবাসার ; কিন্তু আমি স্বার্থপর নই। আমার কারণে কোনো কষ্ট পেও না তুমি। কখনোই পেও না।

বাঃ রে। কষ্ট বুঝি অন্যকে জিজ্ঞেস করে পায় কেউ ? কষ্ট পাবার হলে কষ্ট পেতেই হবে। জানবো, আমার কপালের লিখন তা। কিশা বলল।

না, না। কষ্ট পেও না কোনোরকম। অরি বলল, প্লিজ—

তারপর চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বলল, কোলকাতা ফিরে তোমার সঙ্গে যাতে দেখাই না হয় আর সেই বন্দোবস্ত করব।

কিশার চোখের ভারী-সুন্দর আনত দৃষ্টি আরো নত হয়ে এল।

বলল, বাঃ কী সুন্দর ! এই জন্যেই বুঝি বাইরে নিয়ে এলেন আমাকে ? আমার সুখ পাঁচাবার জন্যে ?

তুমি বুঝবে না কিশা ! তুমি বোঝো না। তুমি জানো না, কতদিন অফিস থেকে ফেরার পথে ; যখন তোমাদের বাড়ির কাছ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ফিরি ; কী ইচ্ছা যে করে আমার তোমাকে একবার দেখে যাই। কিন্তু যাওয়া হয় না। ভাবি, কে কি মনে করবে ! রোজ রোজ গেলে তুমিও হয়ত বিরক্ত হবে। যখন বাড়ি ফিরি, তুমি কি করছ জানতে ইচ্ছে করে। কল্পনা করি, তুমি সন্ধ্যে লাগলেই গা-ধুয়ে, পাট ভাঙা শাড়ি পরে, টিপ পরে ; কেমন সুন্দর করে সেজে আছো।

চুপ করে গেল অরি। তারপর বলল, জানো সবসময় বলি ; আমার যদি স্ত্রী থাকত, অথবা পরজন্মে যখন আমার স্ত্রী থাকবে ; তখন সে যেন অবিকল তোমারই মত হয়।

কি যে বলেন ! এমন করে বলেন না !

কিশা লজ্জা পেয়ে বলল।

একজন পুরুষ একজন মেয়ের কাছে কি চায় জানো কিশা ? কিছুই না ; শুধু একটু মিষ্টি কথা, একটু সহানুভূতি, একটু স্বীকৃতি যে ; মানুষটা তোমারই জন্যে এত কাজ করে, এত ঘাম ঝরায়। এইটুকুই। কী করে বোঝাব আমি। তোমার মত স্ত্রী যদি কেউ পায় সে কী-না করতে পারে জীবনে। কত বড় হতে পারে সে।

কিশা হাসল।

বলল, আপনি বড় সুন্দর করে কথা বলেন।

কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে বলল, আমি যার জন্যে প্রতি সন্ধ্যায় সেজে থাকি, কই, সে তো আমার দিকে একবারও তাকায় না। কোনোদিনও বলে না, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে। আমি তো তার সংসারের অন্যান্য ফার্নিচার-ফিক্সচারের মধ্যে আর একটি মাত্র। আমাকে সে যে সম্পূর্ণ করে পেয়ে গেছে, বেঁধে ফেলেছে আষ্টেপৃষ্ঠে তার সন্তানের জননী করে ! আমি তো আর পালাতে পারব না এ জীবনে। সে যে জেনে গেছে সে-কথা। আমার জন্যে তার আর সময় নেই। তার চোখ আমাকে আর খোঁজে না। আপনি যা দেখেছেন সে তা কখনই দেখেনি। আপনি, আপনি। আপনার জন্যে কিছু করতে পারি আর নাই-ই পারি, আমার কাছে আপনি চিরদিন আপনিই থাকবেন।

তারপর প্রায় পাঁচ মিনিট কেউ কোনো কথা বলল না।

সেই পাগলা কোকিলটা আবার ডাকতে শুরু করেছে সাত সকালে। নিমফুল উড়ছে হাওয়ায়। ডানদিকে বিরাট গাছটা ছায়ায় ঘিরেছে অনেকখানি। অরি সেই ছায়ার দিকে চেয়ে রইল। বড় গাছের ছায়ায় এলেই মনে হয় ভালোবাসার জনের কাছে এলো ও। রুমিকে সে কথা বহুদিন বলেওছে।

কিশা বলল, এ জন্মে কি হবে জানি না, কতটুকু আপনার জন্যে করতে পারব কি পারব না তাও জানি না ; কিন্তু পরজন্মে যেন আপনার মত স্বামী পাই।

অরি বলল, না-ই বা পারলে কিছু করতে। তুমি যা বললে, কখনও তা ভুলব না আমি। আমি যে কারো কাছে এত দামী হতে পারি কখনও, তা আমি কখনও জানি নি। জানো কিশা, রুমি তো আমাকে তোমার চেয়েও অনেক বেশী করে, অনেক দিন ধরে পেয়েছিলো কাছে—রুমিও কখনও তোমার মত করে বলেনি আমাকে। একদিনের জন্যেও না।

কিশা হাসল। বলল, আবার সেই রাগের কথা ! সবাই সব কথা মুখে বলে না ; বলতে পারে না। আমি হয়ত যা বলার গুছিয়ে বলে ফেললাম। সকলেই তো আর তা পারে না। চোখে চোখ রেখে অনেক কথাই বুঝে নিতে হয়। আপনি কিন্তু রুমির প্রতি চিরদিনই অন্যায় করে এসেছেন। আমার মনে হয়। আমি রুমির চেয়ে ভালো কিসে ? আমি যদি বাঁধা পড়ে থাকি আমার সংসারে, তবে সে তো আরও বেশী করে পড়েছে। আপনি হয়ত

বোঝার চেষ্টা করেননি কখনও ওর অসুবিধাটা। ও যা দিতে পেরেছে, নিশ্চয়ই দিয়েছে, আপনাকে দেয় এবং হয়ত দেবেও। আর যা দিতে পারে না, তার দুঃখটা তো তারই। আপনারা অন্য দশজন পুরুষের মত হবেন কেন ? আপনি যে অসাধারণ ! সকলে কি অসাধারণ হয়; না, চেষ্টা করলেই হতে পারে ?

অরি বলল, ইচ্ছে করে, সারাদিন তোমার সামনে বসে তোমার কথা শুনি। তারপরই বলল, তোমার একটা ফোটো দেবে আমাকে ? আমার লাইব্রেরীতে রাখব। দেবে ? তোমার একটা ছবি।

কিশা হাসল। বলল, আমি, রক্তমাংসর আমিই তো আছি আপনার চোখের সামনে, জলজ্যান্ত। আমাকে ছবি করবেন কেন ? আপনি আমাকে চাইলেই পাবেন হাতের কাছে, যখনই ডাকবেন। তাতে যে যাই-ই মনে করুক। কথা দিচ্ছি অরিদা। কিন্তু আমার দুঃখ এইটুকুই যে, আপনার অভাবের অতি সামান্যই পূরণ হবে, আমার দ্বারা।

টুবুল বলল, মা। দ্যাখো কী সুন্দর পাতাটা। লাল টুতটুত্।

কিশা হাসল। বলল, যাও খেলো গিয়ে। বড়দের কথার মধ্যে কথা বলতে হয় না।

তারপর অরিকে বলল, এই টুবুল। টুবুল না থাকলে আমি হয়ত কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম। মা হওয়া বড় কষ্টের। তাছাড়া পিকুর সঙ্গে সম্পর্কটা যেমনই হোক টুবুলের মধ্যে দিয়ে আমরা যে দুজনের কাছে চিরজীবনের মত বাঁধা পড়ে গেছি। বোঝেন না ?

বুঝি, বুঝি, সবই বুঝি। আমি বড় কৃতজ্ঞ তোমার কাছে কিশা। তুমি যা ভেবেছো, করেছো, করছো আমার জন্যে সেটুকু তো আর কেউই করল না। তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আমি জানি না কী করে শুধব তোমার ঋণ !

কিশা বলল, আপনি আমার সঙ্গে সর্ম্পক রাখবেন। আমাকে ভুলে যাবেন না, দূরে যাবেন না আমার কাছ থেকে। যখনই আসতে ইচ্ছে করবে, আসবেন। আপনার যাতে অসম্মান না হয়, তার ভার আমার। যা বলছি, যদি তা করেন; তাহলেই শোধা হবে সব। যদি কিছুমাত্র ঋণ থাকে !

অরি চুপ করে রইল। কিশাও !

অনেকক্ষণ পর কিশা বলল, আরেকজন চান করতে ঢুকল তো ঢুকলই। দেখেছেন ! টুবুলকে চান করাব, আমি করব, একটুও যদি বুঝে থাকে। নিজেরটা ছাড়া কিছু বোঝে না ও।

তারপর বলল, 'একটা কথা বলব অরিদা ?

বল !

আমাকে আপনার কতখানি দরকার আমি তা জানি না, কিন্তু আমি আপনার জন্যে

কতটুকু করতে পারব, তাও আমি জানি না, কিন্তু আপনি জানবেন যে, আপনাকে আমার বড় দরকার। আপনি আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেলে বড় অভাগী হব আমি। আপনার মত কাউকে যে দেখলাম না! আমি কখনও কখনও ভাবি, আপনার সঙ্গে দেখা হলেও তো দেখা হতে পারত আগে। কজন আজে-বাজে লোকের সঙ্গে দেখা হলো, কত ভীরু, ভণ্ড; কত সস্তা খেলনার মত সব মানুষ, কত ফাঁকা কথা,—আপনি কোথায় যে লুকিয়ে ছিলেন? এলেনই যদি, তো এতদিন পরে; এত দেরী করে?

অরির গলা বুঁজে এল। বুকের মধ্যে ভীষণ এক কষ্ট হতে লাগল। কথা বলতে পারলো না কোনো।

অনেকক্ষণ পরে বলল, জানি না, তোমাকে চিরদিনের করে; আমার ঘরের মধ্যে আমার ঘরণী করে পাওয়ার চেয়েও বোধহয় আজকের পাওয়া অনেক বড় পাওয়া! এর চেয়ে বড় কিছু আর কী-ই বা তুমি দিতে পারতে। তবে হ্যাঁ! পুরুষের শরীর বড় যন্ত্রণাময়। কাঁকড়ার মত দাঁড়া দিয়ে সে কামড়ায় পুরুষকে। ভাবছি, জানো; একজন রক্ষিতা রাখবো। কোনো দালাল-টালাল ধরে। রক্ষিতার ঘরে গিয়ে শরীরের জ্বালাটা মিটিয়ে আসবো। ঘামের, তাগিদের, বড় নির্লজ্জ প্রয়োজনের ব্যাপারটা; আমার প্রাণ, আমার মন, আমার আমি বেঁচে থাকবে শুধু তোমারই এই দারুণ দানের মধ্যে। শরীরের ভালোবাসাটাকে মনের ভালোবাসা থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করে ফেলব। তাহলেই সমাজ সংসার বলবে আমরা নিষ্পাপ, নির্দোষ।

তারপর হেসে ফেলল অরি। বলল, জানো কিশা, পারব না।

মনের ভালোবাসাটা দোষের নয়; শরীর হলেই পাপ। কী আশ্চর্য নিয়ম! হাসি পায়।

কিশা চুপ করেই রইল মুখ নামিয়ে।

তারপর মুখ তুলে বলল, একটু আগে যা বললেন, তা করা সম্ভব কী না জানি না। শরীরের ক্ষিদে অন্যত্র মেটালেও যখন তাতেও খুশী না হবেন, আমার কাছে আসবেন। আমি দেব আপনাকে; যা পারি। যতটুকু পারি। একজন মেয়ে যাকে মন দিতে পারে, তাকে শরীরটা দেওয়া কিছুই নয়। এই শরীরে আছে-ট' কি? অথচ আশ্চর্য! নিরানব্বুই ভাগ পুরুষের কাছে, এবং সমাজ যারা গড়েছেন তাঁদের কাছে, এই শরীরটাই দামী। মনের দাম নেই কানাকড়ি।

অরি অবাক বিস্ময়ে, মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল কিশার দিকে।

হঠাৎ অরি চমকে উঠল।

কিশার চোখ অরির চোখে পড়তেই কিশা বলল, এ্যাই অরিদা লক্ষ্মীটি! অমন করবেন না! কষ্ট বুঝি আপনারই একার। আমার বুঝি কিছুই হয় না, না?—লক্ষ্মীটি প্লিজ, এমন করে.....

বলেই, কিশা উঠে ঘরে চলে গেল !

অরি অনেকক্ষণ বারান্দায় বসে রইল। টুবুল এসে যেন কী বলল দুবার। ওর কানে গেলো না। টুবুলকে আদর করে দিল শুধু। তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

অরি গন্তব্য পেয়েছে এত দিনে। পেয়েছে কি ? সত্যি ? বিশ্বাস হয় না ওর। কুচরীপানার দিন বুঝি শেষ হলো। নোঙর পেয়েছে ওর মন। এখন আর ঝড়ের নদীতে মোচার খোলার মত ভাসবে না।

অনেকদিন ধরে দুঃখের গভীরতাকেই ও জেনেছে। ভেবেছে ও দুঃখের বিশারদ। কিন্তু সুখকে এর আগে এত গভীরভাবে বুকের কাছে কখনও অনুভব করেনি। আশ্চর্য হয়ে গেছে ও ! অবাক হয়ে গেছে সুখের ভারে। সুখের ভারও যে এত ভারী এ কথা কালকেও জানেনি। কখনই জানেনি আগে।

চাঁপা গাছটাতে ফুল ফুটে আছে। ঐদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অরি উঠল। ভাবল, কিশার জন্যে ফুল পাড়বে।

টুবুলকে ডাকল। বলল, মাকে ডাকো তো একবার টুবুলবাবু।

টুবুল বলল, ডাকছি।

টুবুলকে এতদিন দেখেছেই অরি; কিন্তু লক্ষ্য করেনি। এই মুহূর্তে প্রথম লক্ষ্য করল যে টুবুলের মুখে কিশার আদল বড় স্পষ্ট। টুবুলকে আবার ডেকে ওকে কোলে তুলে নিয়ে বারবার আদর করল অরি। ওর মনে হল, যেন ও কিশাকেই আদর করছে।

বোধহয় এই-ই প্রথম বড় একটা মুক্তির স্বাদ পেল ও জীবনে। ভারী একটা উদার, আলোমেলা আনন্দ। এমন আনন্দও যে আছে কখনও আগে অনুভব করেনি।

অরি ভুল করেনি। এই প্রথমবার, ভুল মানুষকে ভুল করে ভালোবাসেনি। এই মুহূর্তে অরি তার অন্তরে অন্তরে অনুভব করল যে, ভালোবাসার সব আনন্দ ভালোবাসারই মধ্যে। বললে সে কী পেল তার মধ্যে তার মূল্য একেবারেই বদ্ধ নয়। এমন মুক্তি সে এই জীবনে পাবে কখনও, এমন করে যে কেউ তাকে নিজের অভিমানের, অনাদরের বদ্ধ ঘর থেকে অর্গলমুক্ত করে এই বিরাট বিশ্বে, প্রকৃতির এই অঢেল ঐশ্বর্যের মধ্যে মহিমান্বিত করবে নতুন আয়ু দিয়ে, অরি ভাবতে পারেনি তা।

টুবুলকে ঘরে পাঠিয়ে, গাড়ির বুট খুলে স্টেপনি বের করে টায়ার বদলাতে বসল অরি।

ইতিমধ্যে পিকু বেরোল তৈরী হয়ে। বেরিয়েই হাঁক ছাড়ল, মাইসী, নাস্তা কোথায়। ভীষণ ক্ষিদে।

তারপর অরির দিকে চোখ পড়তেই বলল, ফার্স্ট ক্লাস। যিস্‌কা বাঁদরী, ওহি নাচায়। যার গাড়ি, সেইতো বদলাবে টায়ার ! তাড়াতাড়ি করো দেখি, গাড়িখানা নিয়ে একটু আয়গাটা সার্ভে করে আসি। ঐ টায়ারটা সারানোও তো দরকার। দোকান হবে নিশ্চয়ই কোথাও।

হবে হয়ত, অরি বলল।

টায়ার বদলে এসে অরি বলল, হাতটা ধুয়ে আসি। কিশা কোথায় ?

ওর মাথা ধরেছে। চালাক মেয়েদের সময়মত মাথা ধরে। কোথায় একটু ব্রেকফাস্টটা এ্যারেঞ্জ করবে, না মাথা ধরার ছুতো করে শুয়ে পড়ল।

অরি বলল, ব্রেকফাস্টের বন্দোবস্ত আমি করছি, কিন্তু ও চান করবে না ? টুবুল ? আমরা বেরোব তো ?

আরে সেই জন্যেই তো আসা। নাকি এখানে বসে থাকব সারাদিন ! সেটা বোঝে কে ?

অরি চৌকিদারের ঘরে গিয়ে মাউসীকে তাড়া দিল। মাউসী আর টিব্বা সিং বলল, এক্ষুনি নিয়ে আসছে ওরা, সব গরম গরম্।

অরি বারান্দাতে ফিরে এসে জোরে জোরে বলল, কিশা চান করে নাও। নইলে একেবারে খেয়েই চান করতে যাও। আমরা বেরোব তো ?

পিকু বলল, তুমিই বা ভাসুর ঠাকুর হলে কেন ? যাও না, ঘরে গিয়ে ভাদ্র-বৌ-এর মাথাটা একটু টিপে দাও না ! আমার আবার ওসব আসেনা। তুমি ভালো পারবে।

অরি ঘরে ঢুকলো। মাথা টেপার জন্যে নয়। কিশা শুয়ে ছিল। অরি গিয়ে কিশার মাথায় হাত রাখল। ডাকল, কিশা।

কী যে হয়, কী যে হয়ে যায়; কিশা জানে না। এই মানুষটার হাতের ছোঁয়াতে আবার ওর সেই কালকের মত শিহর লাগলো গায়ে। ধরমরিয়ে উঠে বসলো।

অরি বলল, এসো, খাবে এসো, খেয়ে নিয়ে তারপর চান করে তৈরী হয়ে নাও।

কিশা কথা না বলে বাথরুমে গেল।

অরি ফিরে এসে দেখে, পিকু টুবুলকে নিয়ে খেতে লেগে গেছে।

পিকু সত্যিই একটু অদ্ভুত। নিজেরটাই বোঝে ! অন্য কারো কথা ভাবা ওর স্বভাব নয়। অরি ভাবল।

অরিকে দেখেই বলল, প্লেট নিয়ে নাও। আলুর তরকারী আর পরোটাটা জব্বর হয়েছে। তোমার মাইসীর হাত ভালো।

অরি বলল, মাইসী নয়, মাউসী।

ঐ হলো। বলে, পরোটা ঢোকাল মুখে পিকু।

বলল, কি হল ? নাও। না নিলে পস্তাবে।

অরি বলল, কিশা আসুক। তোমরা খাও।

কিশা বেশ কিছুক্ষণ পরে এলো। মাউসী পরোটা আরও নিয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু অরি আর কিশার জন্যে শুধু একখানা করেই থাকল।

পিকু বলল, এখানের জল ভালো, বুঝলে অরিদা। ভালো ক্ষিদে হয়। বলেই বলল চা, মাইসী; চা।

কিশা একবার তাকাল পিকুর মুখের দিকে। বলল, আমাদের খাওয়া হোক, তারপর চা আমি বানিয়ে দেবো।

পিকু বলল, তুমি তো পাখির মত ঠুকরে ঠুকরে খাবে। ততক্ষণ আমি বসতে পারব না। আমি গাড়ি নিয়ে বেরোব।

তোমার তো লাইসেন্স নেই। কিশা বলল।

এখানে লাইসেন্স দেখবে কে ? তাছাড়া, কিছু হলে তো গাড়ির মালিক বুঝবে। আমার ঘন্টা।

চা আনল মাউসী। পিকু হড়বড় করে নিজেই এক কাপ চা বানিয়ে খেয়ে, টুবুলকে বলল, চল্ ব্যাটা। আমরা ঘুরে আসি। তোর মা আর অরি জ্যাঠা এখন নেকু-নেকু রবীন্দ্রসঙ্গীত গাক—আর চা খাক রসিয়ে রসিয়ে।

টুবুলও চান করেনি তো। অরি বলল।

কিশা বলল, কাল ওর সর্দি লেগে গেছে—গরমে। চান আজ না-ই করল।

পিকু বলল, তবে আর কি ? চল্ ব্যাটা !

বলেই গান ধরলো ছেলের হাত ধরে, "সাধের লাউ, বানাইল মোরে ডুগডুগি"।

দু'মিনিটের মধ্যে টুবুলকে পাশে বসিয়ে পিকু বেরিয়ে গেল। যাবার সময় মুখ বাড়িয়ে অরিকে বলল, বিয়ার না পাওয়া যাক, মহুয়া তো পাওয়া যাবে ?

অরি মুখ না তুলেই বলল, দ্যাখো।

কিশা মাউসীকে ডেকে বলল, শোনো, আর পরোটা যদি থাকে তো বাবুকে দাও।

মাউসী বলল, সব আটাই করে ফেলেছি। সবশুদ্ধ বারোটা পরোটা বানিয়েছিলাম। কম পড়বে, বুঝতে পারে নি।

কিশা অরির দিকে তাকালো।

বলল, আমার থেকে আধখানা নিন আপনি।

অরি বলল, একেবারেই নয়। তুমি ওটা খাও। আমার তো আছে।

কিশা বলল, বুঝলেন কিছু ? কাল রাতে না হয় হুইস্কি খেয়েছিল—আজ সকালে তো বেহুঁশ ছিল না। আমি তো একটা মানুষই নই। কিন্তু আপনি ? যে-মানুষটা সঙ্গে করে নিয়ে এলো সকলকে, তার কথা একটুও ভাবলো না। একাই নটা পরোটা খেয়ে ফেলল। আর একটা নিশ্চয়ই টুবুল খেয়েছে।

তারপর বলল, আমার এত লজ্জা করে না !

খেতে খেতে বলল, বলতে আমার লজ্জা করে, খারাপও লাগে, কিন্তু ছোট ছোট জিনিসেই একজন মানুষের চরিত্র বোঝা যায়।

অরি বলল, আমি তো ব্রেকফাস্ট খাই-ই না। থাকলে নষ্ট হত। ও খেতে ভালোবাসে,

খেয়েছে ; তা নিয়ে রাগ করছো কেন ? সামান্য ব্যাপার। তোমারই বরং খাওয়া হল না। কাল রাতেও কিছু খাওনি।

কিশা মুখ নিচু করে থাকল, চুপ করে।

তারপর বলল, কি বলব, আমার বলার কিছু নেই।

অরি বলল, পিকু ছেলেটা খুব প্রাণবন্ত। পুরুষ পুরুষ। মেয়েরা বোধ হয় এ রকম পুরুষই পছন্দ করে। এনক-আর্ডেন কবিতাটি পড়েছিলে তুমি ?

কিশা হাসল। বলল, হ্যাঁ।

অরি চা বানাল কিশার জন্যে। বলল, তোমার এক চামচ চিনি, দুধ বেশী, তাই না ?

কিশা খেতে খেতে মুখ তুলল। তুলে হাসল।

চা খেতে খেতে অরি বলল, যাও, এবার চান করে সুন্দর করে সেজে তৈরী হয়ে নাও। সারাদিনের জন্যে আমরা বেরোব।

কিশা বলল, যাচ্ছি।

অরি বলল, কি শাড়ি পরবে তুমি এখন ? কি রঙের ?

কিশা অবাক হল।

তারপর বলল, বাবা পয়লা বৈশাখের শাড়িটা আগেই দিয়ে দিয়েছেন। একটা হলুদ-জমি কালো পাড় তাঁতের শাড়ি।

তারপর বলল, কেন জিজ্ঞেস করছেন ?

অরি বলল, তোমার জন্যে চাঁপা ফুল তুলে আনছি। চুলে দিও। খুউব ভাল হবে ঐ শাড়ির সঙ্গে।

কিশা চাঁপা গাছটার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেলো।

আমি চান করতে যাই, কেমন ? বলেই উঠল।

অরি বলল, শোনো কিশা। দাঁড়াও একটু।

কিশা বলল, কি ?

অরি মুখ নামিয়ে, অনেক চেষ্টা করে বলেই ফেলল কথাটা, কখনও কোনো দিন সুযোগ হলে, তোমায় আমি চান করাবো নিজে হাতে একদিন। দেবে তো ? করাতে ?

কিশা অন্যমনস্কতা কাটিয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল।

বলল, কী পাগল ! কী পাগল, আমার হাসি পাচ্ছে।

একটু থেমে বলল, এমন আমি শুনিনি কোথাও। এমনকি পড়িও নি।

অরি বলল, দেখো, আমি কী সুন্দর করে চান করাবো তোমাকে। বসন্তবনের করৌঞ্জ ফুলের তেল মাখাবো তোমার সারা গায়ে। গন্ধরাজ লেবু গোল করে কেটে ফেলে রাখবো বাথ্‌টাবের জলে। কাঁচা-হলুদের সঙ্গে শ্বেত-সর্ষের তেল আর খসস্ আতর মিশিয়ে মুখে

লাগিয়ে দেবো। তোমার হাতের, পায়ের গোলাপি নখ কেটে দেবো, গোলাপ জলে ভিজিয়ে নিয়ে। তারপর কেয়া পাতার মধ্যে ঊষা রঙের পাকা ধুধুলের খেয়া রেখে তাতে চন্দনের গুঁড়ো আর সাদা গোলাপের পাপড়ি মিশিয়ে তোমার গা ঘষে দেবো। প্রথম-বৎসা সাদা গাইয়ের শ্রাবণী পূর্ণিমার দুধে রক্ত-পদ্মর রেণু মিলিয়ে তোমার দুই স্তনে ধারা বওয়াব। প্রথম ভোরের আলো-লাগা রক্ত-পদ্মর মত হয়ে উঠবে তোমার দুটি স্তনের রঙ। তুমি দেখো, কেমন করে চান করাই আমি তোমাকে।

অরির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কিশার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। জবাব দিল না কোনো, অরির হাতে নিজের হাতটা রাখল।

অস্ফুটে বলল, যাচ্ছি।

অরি সিঁড়ি বেয়ে নেমে চাঁপা গাছটার কাছে এলো। কী ফুলই না ফুটেছে এই বনে! গাছে উঠতে হলো না। হাত বাড়ালেই অজস্র ফুল। পায়ের নীচে হলুদ-চাঁপার গালচে। অরি চটিটা খুলে ফেলে খালি পায়ে হাঁটল কিছুক্ষণ।

ফুল তুলতে তুলতে হঠাৎই সেই গানটা মনে এল ওর।

গানের কলিগুলি এক এক করে দূরে উড়ে-যাওয়া পাখির মত, স্মৃতির দাঁড়ে দ্রুত ফিরে আসতে লাগল। এল সবাই। সব কলি সুরও এল ভেসে ভেসে কলির সঙ্গে।

অরি গুন গুন করে গাইল গানটা, ফুল তুলতে তুলতে; সকালের সেই গভীর ভালোলাগায়—

আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে—জানিনে, আমার কী ছিল মনে। এতো ফুল তোলা নয়, এতো ফুল তোলা নয়, বুঝিনে কী মনে হয়, জল ভরে যায় দু নয়নে। আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে।

পরম্পরা

খুব জোরে এঞ্জিনের গোঁ গোঁ আওয়াজ করে বাংলোর গেটের দরজায় প্রায় ধাক্কা লাগিয়ে ঢুকলো গাড়িটা শব্দ করে, ব্রেক করে দাঁড় করালো গাড়িটাকে সিঁড়ির সামনে পিকু।

অরি ফুল তুলে মাউসীর কাছে থালা চেয়ে তাতে সামান্য জল দিয়ে তার উপরে ফুলগুলো সাজিয়ে পিকুদের ঘরে রেখে এসেছিল। ওদের ঘরের দরজা খোলাই ছিলো। কিশা ড্রেসিং-রুমের দরজা বন্ধ করে চান করতে গেছিলো।

পিকু এক লাফে বেরোল গাড়ি থেকে। নেমেই টুবুলকে নামালো এক হ্যাঁচকা টানে।

অরি বলল, এত তাড়াহুড়ো কিসের? যা খুঁজতে গেছিলে, পেলে তা?

পিকু তাড়াতাড়ি এসে অরির পাশের চেয়ারে বসল। টুবুলকে শাসালো, টুবুল! কিছু বলবে না কাউকে!

কী হয়েছে ? অরি উদ্বেগের সঙ্গে বলল।

পিকু অধৈর্য গলায় বলল, এই সময় কিশা কোথায় ? কিশা ?

বলেই অরিকে কিছু না বলেই দৌড়ে ঘরে গেল। গিয়েই বলল, যত সব ফালতু কবিত্ব। ফুল তোলা হচ্ছিল এতক্ষণ—

বলতে বলতে ড্রেসিংরুমের দরজায় গিয়ে জোরে জোরে ধাক্কা দিল।

অরি শুনল, কিশা বলছে ; কি বলছ ?

—তাড়াতাড়ি করো। বেরোলে বলছি।

—আমার দেরী হবে।

—দেরী হলে হবে না, তাড়াতাড়ি করো। আমাদের এখান থেকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে।

পিকু বারান্দাতে এল। এসে, বসেও ছটফট করতে লাগল। এমন সময় টিব্বা সিংকে এদিকে আসতে দেখেই পিকু স্থির হয়ে গেল, যেন কিছুই হয়নি। সিগারেট ধরালো একটা।

টিব্বা সিং কাছে আসতেই ওকে শুনিয়ে, অরিকে বলল, দারুণ সকালটা। তাই না ?

টিব্বা সিং বলল, পেলেন বাবু ? কোনদিকে গেছিলেন ?

পিকুর চোখের ভাবে আর গলায় সাবধানতা লাগল।

বলল, যাব আর কোথায় ? টায়ার সারিয়ে আনলাম বাজার থেকে।

টিব্বা সিং বলল, এখন কোথায় যাবেন ?

পিকু সাবধান হল। বলল, এই বাবুর গাড়ি, এই বাবুই মালিক, এই বাবুই ড্রাইভার। আমি তো বাবা টায়ারটা খালি সারিয়ে আনলাম।

অরি বলল, আমরা রাইরাংপুর হয়ে গরুমহিষিণীতে যাবো। রাতে ফিরে এসে তোমার এখানেই থাকব। মালপত্রও নিচ্ছি না কিছু। ঘরদোর ভাল করে দেখে রেখো। আর মাউসীকে বোলো, আমরা ফিরে আসার পরই খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে। তাড়া নেই। গাড়িতে যাওয়ার ব্যাপার। কোথায় আটকে যাবো, কী হবে, বলা তো যায় না। রাতের খাবারের জিনিসপত্র কিনে আনব আমরা। তুমি থেকো কিন্তু।

ঠিক আছে। টিব্বা সিং বলল।

ও চলে যেতেই, অরি বলল, কি হয়েছে ?

পিকু বলল, পরে বলব। এখান থেকে রওনা হই আগে। যেদিকে যাচ্ছি, সেদিক দিয়ে কোলকাতায় চলে যাওয়া যায় না ? এদিকে আর না এসে ?

হ্যাঁ। রাইরাংপুর থেকে ঘাটশিলা হয়ে চলে যাওয়া যায়।

তাহলে, তাই-ই চল।

অরি বলল, তাহলে মালপত্র সব গুছিয়ে তুলতে হয়।

না, না, মালপত্র থাক। মালপত্র সব নিয়ে গেলে ওদের সন্দেহ হবে আমরা পালিয়ে যাচ্ছি বলে। কীই বা মালপত্র আছে। জরুরী এবং দামী জিনিসগুলো নিয়ে বাকীগুলো রেখে চল। আমাদের প্রাণের দাম জামাকাপড়ের চেয়ে বেশী।

কি হয়েছে কি ? একটু বিরক্তির গলায় অরি বলল।

টুবুল বলল, এ্যাক্‌সিডেন্ট্।

পিকু এক লাফে উঠে গিয়ে ঠাস্‌স্ করে চড় লাগালো টুবুলের গালে, ছেলেটা বারান্দাতে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে একটা লজেন্সের মোড়ক খুলছিল; মাথা ঘুরে পড়ে গেল।

অরি দৌড়ে গেল। কিন্তু পিকু ওকে ধরতে না দিয়ে নিজেই টুবুলের জামার কলার ধরে বেড়ালের মত ঝুলিয়ে নিয়ে ঘরে চলে গেল। ছেলেটার বোধ হয় দমই আটকে গেল। চড় খেয়েই নীল হয়ে গেছিল ও।

অরি বলতে গিয়েও কিছুই বলল না। পিকুর ছেলে, কিশার ছেলে; টুবুল। শ্বেতকেতু তাকে কোনো অধিকার তো দেয়নি, টুবুলকে আদর করার বা শাসন করার। কোনোই দাবি নেই টুবুলের উপর ওর।

অরি আবার বসে পড়ে ভাবতে লাগল, কি হতে পারে পথে। অ্যাকসিডেন্ট তো পিকু নিশ্চয়ই করেছে, কিন্তু কি ধরনের এ্যাকসিডেন্ট ? মানুষ-টানুষ চাপা দেয়নি তো ? তা হলে এক্ষুনি তো বাংলো ঘেরাও হয়ে যাবে। আজকাল গাড়ি যারা চাপে আর যারা চালায় সব দোষই তাদের। তারাই অপরাধী সব সময়ই। গাড়ি চড়াটাই অন্যায় আজকাল।

ওদের ঘরে কিশার ড্রেসিংরুমের দরজা খোলার আওয়াজ হলো। পিকু কিসব বলল কিশাকে ফিসফিস করে। খুব তাড়াতাড়ি কিশা তৈরী হয়ে বাইরে এলো টুবুলকে নিয়ে। তাড়াতাড়িতে শাড়িটা কোনো রকমে পরেছে মাত্র।

টিব্বা সিংকে ডাকলো পিকু। তালা আনতে বলল।

অরি গিয়ে স্টীয়ারিং-এ বসল। পিকুও নেমে এল। কিশার উপর কাঁদতে থাকা টুবুলের এবং ঘর বন্ধ করার ভার দিয়ে। কিছু কিছু মালপত্র পিকু বয়ে নিয়ে আনল ওদের ঘর থেকে। অরির সব জিনিস পড়ে রইল ঘরেই।

অরি নেমে গিয়ে বলল, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার ঘরের জানালাগুলো খোলা আছে। বৃষ্টি এলে সব ভিজে যাবে। কালবৈশাখীর সময়।

কিশা বলল, আপনি যান। আমি আপনার ঘর বন্ধ করে আসছি।

তা হলে টুবুলকে দাও। আর টুবুলকে দেবার জন্যে ক্যাডব্যারিগুলো সব নিয়ে এসো ঘর থেকে।

টুবুল তবুও কথা বলল না। পিকুর চওড়া হাতের পাঁচটা আঙুল বাচ্চাটার নরম গালে গভীর হয়ে বসে গেছিল।

এই প্রথম, পিকু সম্বন্ধে অরির মনে একটা ঘৃণার ভাব ফুটে উঠল ! অরির চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। মনে মনে বলল, উদ্দালক, তোমার ছেলের মায়ের উপর তোমার বিশেষ কোনো অধিকার নেই। আমি তাকে নিয়ে যাবো। তুমি দেখো। তাকে রাখার যোগ্য তুমি নও। কোনোদিক দিয়েই তুমি তার যোগ্য নও।

টিব্বা সিংকে সব বলে গেল কিশা। মাউসী ছিলো না, তার বড় ছেলেকে নিয়ে কোথায় যেন গেছিল। ও জানতো দুপুরে কেউ খাবে না ওরা।

গাড়ি স্টার্ট করল অরি। গাড়িটা গেট থেকে বাইরে এসে বাংরিপোসির ঘাটের রাস্তায় পড়ল।

হঠাৎ কিশা বলল, এ কি ! টুবুল কি হয়েছে তোমার ?

পরক্ষণেই পিকুকে বলল, দেখেছো—কী করেছো ছেলেটাকে ? তুমি কি মানুষ ?

পিকু কাঁপা কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরালো, বলল, প্লিজ কিশা। আমাকে এখন খুঁচিও না। ডোন্ট ইরিটেট্ মী ! তা হলে তোমাকেও.....

কি বললে ? কিশা বলল।

পিকু জবাব দিলো না।

কিশাও চুপ করে গেল।

গাড়িটা বাংরিপোসির ঘাটে উঠেছে ঘুরে ঘুরে। বৈশাখের সকালের মিষ্টি হাওয়া গায়ে লাগছে। শুকনো পাতা উড়ছে। ঘূর্ণী উঠলো একটা হঠাৎ সামনে। একরাশ শুকনো পাতা যেন খয়েরী এক ঝাঁক চড়াই পাখির মত ঘুরতে ঘুরতে উপরে উড়ে চলল।

অরি বলল, টুবুলবাবু কই ? দেখলে টুবুল, পাতাগুলো কী মজা করল ?

টুবুল তবুও কথা বলল না।

অরি আবার বলল, কই টুবুল, তুমি ক্যাডব্যারি খাচ্ছো না ?

টুবুল তবুও কথা বলল না।

রিয়ার ভিউ মিরারে অরি দেখলো টুবুলকে ডান হাতে জড়িয়ে আছে কিশা—বাঁদিকের জানলা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে বাইরে—আর ওর চোখ দুটো জলে ভরে আসছে ধীরে ধীরে।

অরি আরেকটা ইউ টার্ন নিতে নিতে বলল, কি হল ? টুবুলবাবু কি আমার সঙ্গে কথাই বলবে না ? আড়ি করেছো ?

পিকু বিরক্ত গলায় বলল, অরিদা, এখন কথা না-ই বা বললে। একটু কেয়ারফুলি চালাও, পাহাড়ী রাস্তাতে এখন আড়ি-ভাঙানো নিয়ে ব্যস্ত না-ই বা হলে !

অরি একবার তাকাল পিকুর দিকে।

বলল, তুমি এত টেন্স্ হয়ে আছো কেন ? এখন না-হয় কিছু ঘটেছে। একটা এ্যাকসিডেন্ট না হয় ঘটেছে। কিন্তু কি ঘটেছে তাও বললে না আমাকে। টুবুলকে এরকম

মারলে, কিশার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছ। কেন ? কিসের তোমার এত টেনশান ? এরকমভাবে বেঁচে লাভ কি ? বেড়াতে এসে লাভ কি ?

পিকু বলল, আমি কি করি না করি তার এক্সপ্ল্যানেশন কাউকে দিতে অভ্যস্ত নই আমি। তুমি ভালো করে গাড়িটা চালাও তো ! তোমার আর কি ? একা লোক ! মরলে তো বৌ-বাচ্চা সমেত আমিই মরব। বিয়ে তো আর করো নি। দায়িত্ব, কর্তব্য, চিন্তা কাকে বলে বুঝতে পেতে হাড়ে হাড়ে। তাহলে গায়ে-হাওয়া দিয়ে অত কবিত্ব করে বেড়াতে হতো না।

অরি জবাব দিলো না কথার। একবার তাকালো শুধু পিকুর দিকে।

এত সুন্দর দৃশ্য এই ঘাটটির !—কিন্তু কিশা কোনো কথাই বলছে না। টুবুলও চুপ চাপ। পিকুর চোখে এসবের কোনো দামই নেই। সে এ্যাকসিডেন্ট না করলেও, মুখ গোঁজ করে থাকত হয়ত বিয়ার পাওয়া গেলো না বলে, নয়ত জানলা দিয়ে বাঁ হাত গলিয়ে দিয়ে গাড়ির ছাদে তবলা বাজাত আর গাইত : 'সাধের লাউ, বানাইলা মোরে ডুগডুগি !'

অরি লক্ষ্য করেছে যে, এক একটা সময় ওকে এক-একটা গানের ভূতে ধরে। দু'একমাস ঐ একই গান গেয়ে যাবে। ক্ষিদে পেলেও গাইবে, পেট ভরে খেলেও গাইবে, চান করে উঠে তো গাইবেই। অবশ্য ও যা গায়, তা গান নয়। কথাগুলো আবৃত্তি করে, টেনে টেনে বিকৃত উচ্চারণে। কিছুদিন আগে 'শোলে' ছবির একটা গানে পেয়েছিল ওকে। সেটা গান, না মারামারি, কিছুই বুঝতে পারত না অরি।

পিকু একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চলেছে। সেই ভিউ পয়েন্টের জায়গাটা পেরিয়ে গেলো ওরা। ঘাটটা পেরিয়ে একটা জঙ্গল ঘেরা সমতল জায়গায় পৌঁছলো। এখানেই হাতী দেখা যায় বোধহয়, কে জানে ? জঙ্গল ভালোবাসে, কিন্তু জঙ্গল জানে না, বোঝে না কিছুই অরি।

সেই সমতল পেরিয়ে একটু চড়াই উঠেই আবার চমৎকার রাস্তায় পড়ল গাড়িটা। ভারী ভাল লাগছে এখন। যার এসব সবচেয়ে ভালো লাগে, যে প্রকৃতি-পাগল, দারুণ, দারুণ রোম্যান্টিক; সেই কিশাই কিছু বলছে না ! একেবারেই চুপ করে গেছে।

ভারী খারাপ লাগতে লাগল অরির !

ডিজেলের অভাব চলেছে, গত ছ-মাস হলো আসামের গণ্ডগোলে অসামান্য ক্ষতি হলো দেশের, কিন্তু এখন হাইওয়েতে গাড়ি চালিয়ে খুব আরাম। বাস যা চলার চলছে, ট্রাকের সংখ্যা একেবারেই কম। পথ প্রায় ফাঁকাই।

বাংরিপোসির ঘাট পেরোবার পর অরি বলল, কি হয়েছে, এবারে কি বলবে, আমাকে, পিকু ?

পিকু বলল, আইনটা কি ? আমার যদি লাইসেন্স না থাকে এবং হাতেনাতে আমাকে যদি ধরতে না পারে কেউ, তাহলে আইনটা কি ?

আইন বলে, গাড়ির মালিকেরই সব দায়িত্ব। গাড়ি ঘটিত যাই-ই হবে, সবই তার দায়িত্ব। গাড়ির মালিক যদি লাইসেন্স ছাড়া কাউকে গাড়ি চালাতে দেয় তাহলে এ্যাকসিডেন্টের দোষও তারই।

তারপর বলল, তোমাকে এ্যাকসিডেন্টের সময় কেউ কি দেখতে পেয়েছে ?

না। কেউ কোথাওই ছিলো না।

কিশা বলল, টুবুল ছিল।

পিকু বলল, টুবুল কোনো ফ্যাক্টর নয় !

তাহলে, যদি কোনো গোলমাল হয়ই পরে, তবে তোমার বলারই দরকার নেই যে তুমি চালাচ্ছিলে গাড়ি। আমার লাইসেন্স আছে, আমার ঘাড়েই আসুক ব্যাপারটা। সুতরাং বুঝছই, তোমার এত টেন্স্ হয়ে থাকার কোনো কারণ নেই। ওরা মারলে আমাকে মারবে, আমার গাড়ি ভেঙে দেবে। তোমার এখন তো আর চিন্তা নেই।

পিকু অরির দিকে ফিরে বলল, এখন তো বড় বড় কথার তুবড়ি ছুটোচ্ছ, ওরা যদি মারতে আসে তখন তো বলবে না যে, তুমিই চালাচ্ছিলে ? তখন তো আমাকে আঙুল দেখিয়ে দেবে।

তখনই দেখবে কি করি। আগে থেকেই ভাবছো কেন ? অরি বলল।

বলেই বলল, কি চাপা দিয়েছিলে ? ছাগল ?

না।

গরু ?

না।

মুগা ?

না।

এবার অরির গলায় উদ্বেগের সুর লাগল, গাড়ির গতি কমিয়ে এনে জিজ্ঞেস করল, কি তবে ? মানুষ ?

হ্যাঁ। সিগারেটের ধোঁওয়া ছেড়ে পিকু বলল।

একটু চুপ করে থেকে অরি বলল, সীরিয়াস ইনজুরি ?

হ্যাঁ। মাথায়।

অরিকে ব্যথিত, বিষণ্ণ দেখালো।

মিনমিনে গলায় শুধোলো, বেঁচে আছে তো ? হাসপাতালে নিয়ে গেল না কেন সঙ্গে সঙ্গে তুলে ! একটা মানুষের প্রাণ ! আহা ! এমন করে ফেলে পালিয়ে এলে ?

পিকু বলল, ওখানে থামতে গেলে নিজের প্রাণই যেতো। উপায় কি ছিল ?

কেন ? বললে তো লোকজন কেউই ছিলো না।

হ্যাঁ। তা ছিলো না। তবে এসে পড়তে পারত। পিকু বলল।

একটু ভেবে বলল অরি, পুরুষ না মেয়ে ? বয়স কত ?

ছেলে, পিকু বলল।

তারপরই বলল, টুবুলের মত।

কিশা চিৎকার করে উঠল পিছন থেকে, কি বললে ? টুবুলের মত ? আর তুমি রাস্তায় তাকে ফেলে চলে এলে ?

চুপ করো। ইডিয়টের মত কথা বোলো না।

ধমক দিয়ে পিকু বলল।

অরি চুপ করে রইল একটুক্ষণ, তারপর বলল, গাড়ি ঘুরোচ্ছি আমি, আমার এক্ষুণি বাংরিপোসি ফিরে যাওয়া দরকার। চলো, তোমাদের বিসোইতে ডাকবাংলোতে তুলে দিয়ে আসছি। তোমরা ওখানে বিশ্রাম করো, আমি ফিরে আসব দু'ঘন্টার মধ্যে।

পিকু বলল, তার দরকার হবে না।

অরি গাড়ি থামিয়ে, পথের বাঁদিকে রেখে বলল, কেন ? দরকার হবে না মানে কি ? কি বলতে চাইছো তুমি ?

বললামই তো, দরকার হবে না।

বেঁচে নেই ? অরি ভীত আতঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করল।

পিকু মাথা নাড়ল। আরেকটা সিগারেট ধরালো।

কিশা টুবুলের দিকে চাইল। টুবুল দু'পা তুলে সীটের উপর বসে ছিল। ওর গালে এখনও পিকুর পাঁচ আঙুলের দাগ লাল হয়ে ফুটে রয়েছে। কাছে টেনে নিল টুবুলকে। টুবুল শক্ত হয়ে রয়েছে।

কিশার মনে হল, তার ছোট্ট, আদো-আদো কথা বলা টুবুল যেন এক সকালে অনেক বড় হয়ে গেছে।

শৈশবে থেকে সোজাসুজি বার্দ্ধক্যে পৌঁছে গেছে।

গরুমহিষিণী ও রামচন্দ্র মিশ্র

মেঘ করেছে আকাশে। রোদ নেই আর। দূর থেকে বিসোই জায়গাটা দেখা যাচ্ছিল। বনের মধ্যে দিয়ে চওড়া রাস্তা চলে গেছে। দু'পাশে এক সারি দোকান।

অরি মাথা থেকে খুনের ভারটা সরিয়ে দিতে চাইল। ও কেন অন্যের অপরাধের ভারে ন্যুব্জ হয়ে থাকবে। কি লাভ ?

ও বলল, একটু আগে ঘাট পেরিয়েই যে রাস্তাটা দেখা গেল, সেটা গেছে যোশীপুর। পোষা বাঘ খৈরী আছে সেখানে। বুঝলে, টুবুল ?

অন্য সময় হলে কিশা লাফিয়ে উঠত এ কথা শুনে।

বলত, চলুন, চলুন অরিদা, যাই।

টুবুলও হয়ত আদো-আদো গলায় বলত, আমি দাব।

কিন্তু ওরা চুপ করেই রইল। গাড়ির মধ্যে আবহাওয়া থম্‌থমে হয়ে রয়েছে। কেউই কোনো কথা বলছে না। পিকু কেবল সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে, একটার পর একটা। ড্যাশবোর্ডের উপরের এ্যাশট্রেটা সিগারেটের টুকরোতে ভরে উঠেছে। বাইরের আবহাওয়াও এখন বড় বিষণ্ণ মেদুর ধূসর, কালো। মেঘ জমছে আস্তে আস্তে পশ্চিমের আকাশে। কালবৈশাখীর মাস এটা। হয়ত ঝড়-বৃষ্টি হবে।

কিশার মত রোম্যান্টিক, সৌন্দর্য-পাগল, সুরুচিসম্পন্ন, প্রকৃতিপ্রেমিক মেয়ে আর দেখেনি অরি। এই বৈশাখী দুপুরের শালফুল-ওড়া কালো চুল-ছড়ানো মেঘলা আকাশ দেখে কিশার নিশ্চয়ই পুলক জাগত। বলত, ঈস্‌সস্‌, অপূ-র্ব! সুন্দর কিছু দেখলেই কিশা বলে অপূ-র্ব! কিন্তু এমন জায়গায়, এমন পটভূমিতে এমন আকাশ দেখেও কিশা চুপ করেই রইল।

অরির খুউব খারাপ লাগতে লাগল। পিকুর উপর রাগও হতে লাগল। গাড়ি চালাতে না জেনে, লাইসেন্স ছাড়া অন্যের গাড়ি নিয়ে গিয়ে এমন একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটাবার দরকার ছিলো না। ওর মনেও একটুও ভালো লাগা নেই। ও-ও চুপ করে গেল।

ছেলেটা, টুবুলের মত ছেলেটাকে ঐ অবস্থায় একা ফেলে পালিয়ে এলো পিকু। ভাবলেই গা গোলাচ্ছিল অরির। কি করে পারল?

পিকু বলল, যোশীপুর থেকেই নাকি সিমলিপালে যেতে হয়?

যেন এ্যাকসিডেন্টটা ভুলবার জন্যে অরি বলল, হ্যাঁ একবার গেছিলাম। চাহালা, ন-আনা, জেনাবিল, বড়াকামরা, বড়াইপানি, বাছুরিচরা, ধুধুরুচম্পা—আহাঃ কি সব জায়গা। দিনের বেলাতেও এত হাতী আর কোথাওই দেখিনি। বুনো কুকুরও দেখেছিলাম। তাছাড়া, এমন প্রাকৃতিক দৃশ্যও কম বনেরই আছে।

পিকু বলল, চলো একবার ওদিকেই যাই সকলে মিলে।

অরি বলল, বড্ড ঝামেলা। নুন-লংকা-চাল-ডাল-পেট্রোল-কেরোসিন সব ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যেতে হয়।

তারপর ভাবল, কিশাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে রান্না করিয়ে কষ্ট দিতে পারবে না ও। কিশার মত মেয়ে তুলোর মধ্যে করেই রাখবার জন্যে। কিশাকে নিয়ে এলে সঙ্গে রান্নার লোকও আনতে হয়। সে সব অনেক ঝামেলা। তাছাড়া, যাঁরা জঙ্গল-টঙ্গল বোঝেন, জঙ্গলেরই মানুষ যাঁরা, তাঁরা স্বতন্ত্র। অরির মত, ভীতু, শহুরে লোকের পক্ষে একা একা ওসব জায়গায় যাওয়া দুঃসাহসের কাজ। চলন্ত গাড়িতে বসে বা সাজানো বাংলোতে থেকে

বন জঙ্গল এ্যাডমায়ার করা এক জিনিস, আর জঙ্গলের একেবারে বুকের মধ্যে জংলীর মত থাকা অন্য জিনিস। সকলের সব আসে না। তারপর পিকুর মত কোম্পানী নিয়ে ? এত ডিম্যান্ডিং, কমপ্লেইনিং, ইরিটেবল সঙ্গীকে নিয়ে কোথাওই যেতে নেই। কিশার কথা আলাদা। কিন্তু কিশা পিকুরই বিয়ে-করা বউ। কিশার উপরে অধিকার অরির আর কতটুকু !

ক'টা বাজে ? অরি শুধলো।

পিকু বললো, বারোটা।

আমরা কি বিসোইতে খেয়ে নেবো ? টুবুলবাবুর কী ক্ষিদে পেয়েছে ? অরি বলল।

টুবুল চুপ করে রইল।

কিশা এতক্ষণে কথা বলল।

বলল, আমার ক্ষিদে নেই। আমি কিছুই খাবো না। তবে টুবুলকে একটু খাইয়ে নিলে ভালোই হত !

অরি গাড়িটা ডানদিকে প্রায় দোকানের লম্বা সারির শেষে একটা দোকানে দাঁড় করাল।

একজন বেঁটে মত ভদ্রলোক দৌড়ে এসে বললেন, আরে কী খবর ব্যানার্জিবাবু ?

অরি বলল, ভালো তো ?

ভদ্রলোক বললেন, ভালো। নামুন নামুন।

আলাপ করিয়ে দিল ওদের সঙ্গে। বলল, এঁর নাম রামচন্দ্র মিশ্র।

রামবাবু বললেন, আজ্ঞে আমি একজন লেখক। প্রেস রিপোর্টারও বটে। আমারই এই পাইস্ হোটেল।

কিশা নেমে খোঁজ করল কী খাওয়ার আছে।

তারপর অরির দিকে ফিরে বলল, টুবুলের জন্যে ডাল ভাত আর একটা ডিমসেদ্ধ করে দিলে ভালো হয়।

অরি রামবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, আলু সিদ্ধ হবে ?

সব হবে। মাংসও আছে।

তারপর বললেন, খালি খোকাই খাবে ? আপনারা ? খোকার মা ? বাবা ? খোকার মায়ের ভাসুর ?

ওঁর কথার ধরনে কিশা হেসে ফেলল। নিঃশব্দে।

এই ই সুযোগ গুমোট কাটাবার। অরি সঙ্গে সঙ্গে বলল, দেখুন তো রামবাবু, এঁরা সব দাঁতে দাঁড় দিয়ে পড়ে আছেন, আমার উপর রাগ করে, কিছুই খাবেন না বলে ঠিক করেছেন।

রামবাবু বললেন, একবার আমার কাছে যখন থামাই হয়েছে, তখন না খাইয়ে তো ছাড়ছি না আমি ! কাউকেই ছাড়ছি না। বলেই কিশার দিকে তাকালেন।

খুব ভালো কথা। খাওয়ান তো আপনি এদের। অরি বলল।

পিকু, বলল, আমি তো খাবোই। আমার ভীষণ ক্ষিদে পেয়ে গেছে।

কিশা একবার ওর দিকে তাকাল। তারপর অরির দিকে।

অরি কিশার দিকে এক ঝলক্ চেয়েই বলল, সকলেই খাবে রামবাবু।

তখন কিশা বলল, তাহলে টুবুল যা খাবে তাই-ই খাব আমি। ভাত, ডাল, ডিমসেদ্ধ।

রামবাবু বললেন, ফার্স্টক্লাস আলুভাজা করে দিচ্ছি। কড়কড়ে করে। এঁচড়ের তরকারীও খেতে পারেন! এখনই তো এঁচড়ের স্বাদ। আমরা এঁচড়কে বলি পনস। জানেন! আমার এখানে টেস্ট করে দেখুন। পাকা এঁচড় নয়—মুখে দিলে মনে হবে মাংসই।

পিকু হঠাৎ বলল, বিয়ার পাওয়া যাবে এখানে?

রামবাবু বল্লেন, বেয়ার মানে? ভাল্লুক?

পিকু অভদ্রর মত বলল, না মশাই। ভাল্লুক নয়, বোতলে করে খায়, হলুদ হলুদ, বুড়বুড়ি ওঠে।

রামবাবু একটু অপ্রতিভ হলেন। বললেন, না! রাইরাংপুর পেতে পারেন।

রামবাবু সরে গেলে অরি আড়ালে কিশাকে বলল, যা হয়েছে হয়েছে, তুমি না খেলে কিন্তু আমি খাবো না।

কিশা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল অরির মুখে। তারপর বলল, ঠিক আছে। খাব।

তারপর বলল, এই রামবাবুকে চিনলেন কী করে?

এই! গতবারে এসে ওঁর হোটেলে যাওয়া আসার পথে খেয়েছিলাম। অটোমোবাইল এ্যাসোসিয়েসানের একজন চাঁই আমার সঙ্গে ছিলেন, সেই সূত্রে আলাপ।

কিশা, টুবুল আর অরি ডাল ভাত, আলুভাজা, ডিমসেদ্ধ ও এঁচড়ের তরকারি খেলো। পিকু মাংস খেলো, দই খেলো, দু-রকমের তরকারি খেলো। তারপর পাশের দোকান থেকে মিষ্টিও আনিয়ে খেলো।

বলল, এখানের দুধ ভালো তো! তাই দুধের মিষ্টিও খুব ভালো।

রামবাবু দাম নিতে চাইলেন না। অরি জোরাজুরি করে দাম মিটিয়ে দিল। কিশাকে বলল, পান খাবে?

আপনি খেলে খেতে পারি।

জর্দা খাবে?

কিশা হাসল। বলল, আমার মা খান। শাশুড়ী-মায়েরও খুব নেশা, আমারও প্রায় ধরে গেছে।

তারপর বলল, একশ-বিশ বাবা-জর্দা পাওয়া যাবে?

অরি বলল, বাবা না-পেলেও জ্যাঠা-কাকা কিছু একটা পাবে। মাথাটা একটু ঝিম্‌ঝিম্ করলেই তো খুশী তুমি?

কিশা আবারও হাসল।

অরির খুব ভালো লাগল এতক্ষনে কিশা হেসেছে বলে।

অপরাধ; অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ যে মানুষটি করেছে তারই গ্লানি নেই বিন্দুমাত্র; অনুশোচনা নেই। গাড়িতে মানুষ চাপা পড়াটা কিন্তু নতুন নয়। দু-পক্ষের এক পক্ষের অসাবধানতার জন্যেই যে-কোনো দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু এমন মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটার পরও পিকুর মনোভাবটা কিছুতেই স্বাভাবিক বলে মানতে পারছিলো না কিশা। অরি তো পারেই নি!

কিন্তু পিকুর জন্যে ওরা কেন মিছিমিছি এমন সুন্দর দিনটা, এমন সুন্দর সব মুহূর্ত নষ্ট করবে? করা উচিত নয় অন্তত।

কিন্তু ছেলেটা! আহা! টুবুলের মত ছেলেটা! ভাবা যায় না।

পানের দোকান থেকে পান নিয়ে এসে কিশাকে দিয়ে, নিজেও খেলো অরি।

মনে মনে বলল, একটাই জীবন কিশা। একটাই জীবন। তোমার এবং আমার। এমন ভাবে অনুযোগ, অভিযোগ, অনিচ্ছা, ঘৃণার মধ্যে তাকে নষ্ট কোরো না। এখনও সময় আছে; ভেবে দ্যাখো। পিকুর সঙ্গে তোমার কোনই মিল নেই। তুমি আমার হও। এখনও সময় আছে কিশা! এসো আমার কাছে, আমার বুকে এসো।

পিকুর দিকে ফিরেই অরি বলল, সরি! তোমার জন্যেই আনা হয়নি। নিয়ে আসছি। কী পান খাবে তুমি, পিকু?

পান? আমি পান খাই না। যদিও করি! সায়েবদের কোম্পানিতে কাজ করে এসব ডার্টি হ্যাবিট রাখলে চলে না।

অরি বলল, এখন দেশে সায়েবদের কোম্পানি বলে কোন্ কোম্পানি আছে? সব কোম্পানিই তো ইন্ডিয়ানাইজড্ হয়ে গেছে। ফেরার ফেরে।

তবুও, সায়েবদের আদর্শটা ফলো করার চেষ্টা করি।

অরি বলল, তা ভালো!

কিশা বলল, মা পান খান বলে ভাগ্যিস রাগ করো না নিজের মায়ের উপরও।

পিকু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, মার কথা আলাদা। মার অভ্যেস-টভ্যেস সব কেরানীদের বউদেরই মত। কিশা যে কী করে এই নোংরা হ্যাবিট করল জানি না। যাক্ এ নিয়ে আলোচনা না-করাই ভালো। ওর সঙ্গে আমার কোন্টাই বা মেলে? বিয়ে করেছি, ফেঁসে গেছি। তবু, চালিয়ে যাবো বাকী জীবন! ভাবি না, মিল-অমিলের কথা আর।

অরি মনে মনে বলল, কিশা! তোমার সঙ্গে অরির কিছুই মেলে না। এখনও ভেবে দ্যাখো! পিকু নাকি ফেঁসে গেছে। শুনেছো! পিকু ফেঁসে গেছে। এসো, এসো, তুমি এই চোরাবালি থেকে উঠে এসো। তুমি আমার হও কিশা!

কিশা পিকুর কথার নীরব প্রতিবাদে একবার পানের পিক্ ফেলল, প্রায় পিকুর পায়ের কাছেই। মনে হল; ইচ্ছে করেই। পিকুর প্রতি ওর ঘেন্নাটাকে তরল লালিমাতে গলিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল। তারপর ইঙ্গিতে জর্দা-খাওয়া জবজবে গলায় অরির দিকে চোখ তুলে বলল, আর একটু জর্দা।

অরি এনে দিল। তারপর টুবুলকে নিয়ে একটা স্টেশনারী দোকান থেকে বাবলগাম্ আর লাল-নীল-মুড়ির মত লজেন্স কিনে দিল।

টুবুল বলল, এ তব তি ?

লজেন্স !

তুমি ঠকাত্তো আমাকে। এগুতো মুলি।

অরি বলল, যখন খাবে, তখন বুঝবে !

কী মজা ! মুলি লজেন্স, টুবুল বলল।

প্রায় দু'ঘন্টা পরে কথা বলল; হাসল ছেলেটা। ভারী ভালো লাগল অরির। ও ভেবেছিল, টুবুল বুঝি বাকি জীবন আর কথাই বলবে না।

তারপর বলল, তুমি এবারে সামনে এসে বসবে টুবুল ? তোমার বাবার কোলে ? কালকে যে বসতে চেয়েছিলে ?

না, না ! বলে ভীত গলায় জোরে চিৎকার করে উঠলো টুবুল।

বলল, আমি মার থঙ্গে বতব !

ঠিক আছে।

বলে, অরি গাড়ির দরজা খুলল !

তারপর কী যনে হতে রামবাবুকে শুধোলো, এখানে ইনস্পেক্শান বাংলো আছে পি-ডাব্লু-ডির ? নিরিবিলি ? থাকা যেতে পারে, প্রয়োজনে ? রামবাবু ? নয়ত.....

আপনারা যাচ্ছেন কোথায় ?

গরুমহিষিণী।

ওঃ, তাহলে এখানে কেন থাকবেন ? ওখানের ইন্স্পেক্শান বাংলো খুব ভালো। দারুণ নির্জন জায়গা, সুন্দর বাংলো।

সেখানে তো আমার জানা কেউ নেই ! এখানে আপনি ছিলেন। আপনি আছেন বলেই সুবিধে।

রামবাবু বললেন, কোনো চিন্তা নেই। এই সব অঞ্চলে যেখানে আমার নাম বলবেন, সেখানেই কাজ হবে। ওখানে গিয়ে যদি কোনো অসুবিধা হয়, তাহলে আমাকে একটা ফোন করে দেবেন।

আপনার ফোন নম্বরটা ? অরি বলল, সবিনয়ে।

মানে....., যদিও আমার নিজের ফোন নেই। কিন্তু যে কোনো জায়গায়, ফোন করে নিতে পারেন। পোস্ট অফিসে। স্টেশন। যে-কোনো জায়গা থেকে। ওয়্যারলেসও করে দিতে পারেন থানাতে।

তারপর বললেন, কিছুরই দরকার হবে না। আমার নাম বলবেন, তাহলেই হবে। কোনো অসুবিধাই হবে না।

ধন্যবাদ দিয়ে অরি গাড়িতে উঠল।

পিকু বলল, কী সব নামরে বাব্বা। গরুমহিষিণী। ঝাড়্ফুকুরিয়া। বাংরিপোসি। ভালো জায়গাতেই নিয়ে এলে।

অরি বলল, কেন ? নামগুলো সুন্দর নয় ?

পিকু বলল, তুমি সুন্দর তাই সবই সুন্দর দ্যাখো। গরুমহিষিণী যদি সুন্দর নাম হয়, তবে ভেড়াছাগলানী বা কুকুরবেড়ালানীও সুন্দর নাম।

অরি আবহাওয়াটাকে আরও স্বাভাবিক করে তোলার জন্যে বলল, হোয়াটস্ ইন আ নেম ? শেকস্পীয়ার তো বলেই গেছেন।

বলেই বলল, কি বলো কিশা।

কিশা পান খেতে খেতে বলল, আমি শুনছি। কিছু বলব না। বলছি না।

পিকু বলল, গরুমহিষিণী জায়গাটা কেমন ?

অরি বলল, শুনেছি, জঙ্গল আছে গভীর—থাকার পক্ষে খুব সুন্দর জায়গা। আমার জানাশুনা এক ভদ্রলোকের কাছেই শোনা। আমি যাইনি কখনও।

ফার্স্ট ক্লাস। যদি ভালো লাগে, এক রাত থেকেই যাবো। কালকেই ফেরা যাবে বাংরিপোসি। আশাকরি ততক্ষণে ইট উইল বী অল কোয়াইট ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট।

অরি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গাড়িটা আস্তে করে জর্দার পিক ফেলে বলল, দ্যাখো।

একটু পরই কিশা পান-মুখে জব্জবে করে বলল, অরিদা।

অরি গাড়িটা আবার দাঁড় করিয়ে দিল।

কিশা, দরজা খুলেই পিক্ ফেলল।

বলল, গাড়ির চাকাতে বোধহয় লাল রঙ লেগে গেল পানের পিকের।

বলেই বলল, যাক গে। পানের পিকের রঙ মানুষের রক্তের চেয়ে অনেক হালকা। উঠেও যাবে সহজে।

পিকু মুখ ঘুরিয়ে বলল, স্টপ ইট কিশা। কবে যে সেন্স হবে তোমার জানি না।

অরি বলল, ব্যস্স ব্যস্স—বলেই বাঁ হাতে রুমালটা পাশ থেকে তুলে বলল, সাদা ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দিলাম। আর নয়। প্লিজ।

পিকু তখনও রেগে ছিল। বলল, লেখাপড়া জানা ভদ্রলোক কী করে পান খায় জানি না। ভদ্রমহিলাদের কথা ছেড়েই দিলাম।

অরি বলল, আমি ভদ্রলোক নই। সুতরাং তোমার কথা ঠিক।

পিকু জবাব না দিয়ে গুম হয়ে রইল।

বিসোই-এর পর রাস্তাটা একটা উপত্যকার মধ্যে দিয়ে গেছে। মেঘলা করেছে, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। বৃষ্টি হচ্ছে বোধহয় কোথাও। শুকনো পাতার সঙ্গে হরজাই গন্ধ উড়ছে হাওয়ায়। ওরা রামবাবুর দোকান ছেড়ে এসেছে প্রায় পনেরো মিনিট। ষাট সত্তর কিমিতে চলছে গাড়ি।

কিশা হঠাৎ বলল, অরিদা, দাঁড়ান দাঁড়ান, একটু দাঁড় করান গাড়িটা—হাওয়ার শব্দ শুনি কান পেতে, বনের কী বলার আছে শুনি একটু।

অরি গাড়িটা দাঁড় করাল বাঁয়ে। বড় ভালো লাগল ওর। ভাবল, কী সুন্দর মন কিশার। ওর মধ্যে কত কী জিনিস আছে যা অরির সঙ্গে একেবারেই মিলে যায়। ওর মনেও এই কথাটাই এসেছিল বিসোই ছাড়বার পর থেকেই, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারেনি, কে কী মনে করবে বলে।

পিকু ভরপেট খেয়ে জানলায় মাথা রেখে ঘুমিয়েই পড়েছিল। ঠিক ঘুম নয়, তন্দ্রা মত। হঠাৎ ধড়মড় করে জেগে উঠে বলল, একী! এ কোথায় এলাম? টায়ার পাংচার? পুলিশ?

অরি বলল, তাড়াহুড়ো করছি না। আমরা তো আর কাজে বেরোইনি। বেড়াতে বেরিয়েছি। ধীরে-সুস্থে যাওয়াই ভালো।

আশ্বস্ত হয়ে পিকু বলল, তা ত বুঝলাম। এখানে কি? উদোম, বুনো জায়গা!

তিতির আর ঘুঘু ডাকছিলো দুপাশ থেকে। ঝরঝর শব্দে শুকনো পাতা গড়িয়ে যাচ্ছিলো পাথরে আর রুক্ষ মাটিতে ঝরণার মত। সেই গানটা মনে পড়ে গেল অরির, শুকনো পাতা কে যে ছড়ায়, কোন দূরে কোন দূরে.....

অরির মনটাও যেন দূরে, কত দূরে উড়িয়ে নিয়ে গেল হাওয়াটা শুকনো পাতার রাশির সঙ্গে।

কিশা মন্ত্রমুগ্ধর মত চুপ করে ছিল। একেবারে আবিষ্ট।

ফিস্ ফিস্ করে কত কথা উঠছে বনের মধ্যে। কে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেললো। গাড়ি-চাপা পড়া ছেলেটির বিধবা মা? না কি কিশা? অরিই কি ফেলল? না, না, বনের মধ্যের শব্দ। কত চাপা দীর্ঘশ্বাস, কত চাপা হাসি, গানের কলি, ফুলের বাস পাতার ঘ্রাণে কত না-বলা কথা, পাতায় পাতায় ডালে ডালে কত কী কানাকানি। যে শুনতে জানে, সে-ই শোনে, আর যাদের চোখ নেই, কান নেই, নাক নেই, তারা ভাবে.....

অধৈর্য গলায় পিকু বলল, কি হচ্ছেটা কি তোমাদের? আমার গরম লাগছে। কতগুলো পাগলের পাল্লাতে পড়েছি। হরিবল্।

অরি অনিচ্ছায় গাড়ি স্টার্ট করল।

সামনেই কোথাও হাট আছে আজ। আদিবাসী মেয়েরা সেজেগুজে, চুলে ফুল গুঁজে, ঝুড়ি, তেলের শিশি, মুরগী, ছাগল, লাউ কুমড়ো নিয়ে চলেছে। ওদের পায়ে পায়ে লাল ধুলো উড়ছে। হাওয়ার সওয়ার হয়ে উড়ে যাচ্ছে সিঁদুর-রঙা অস্থিরমতি ধুলোর রাশ। এক ঝাঁক সাদা বক মালার মত দুলতে দুলতে ডানদিকের পাহাড় পেরিয়ে উপত্যকার মধ্যে উড়ে এল। কোণাকুণি চলে যাচ্ছে ওরা। বাঁদিকে কোথাও কোনো নদী বা জলা আছে বোধহয়।

আর কিছুটা যেতেই দেখা গেল, বগারী পাখির ঝাঁক কিঁচ্‌কিঁচ্ করে উড়ল দ্রুতগতি স্বপ্নের মত এঁকে বেঁকে, এলোমেলো; ছোট ছোট ডানায় উড়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে নীচু হয়ে মাঠময়, গাছময় ছড়িয়ে যাচ্ছে দান দেওয়া তাসের মত। পরমুহূর্তেই একত্রিত হয়ে এক-শরীরে উঠে যাচ্ছে আবার উপরে। ওদের ডানাতে মেঘলা দুপুরের মন কাঁপছে তির্‌তির্ করে—।

অরি যতদূর দেখা যায়, ওদের দেখতে লাগল।

কিশা বলল, কি পাখি ওগুলো অরিদা?

বগারী। অরি বলল।

পিকু বলল, এইগুলোই বগারী? খুব ভালো রোস্ট হয়। একবার বহরমপুরে গেছিলাম আমার এক কলিগ-এর সঙ্গে উইক-এণ্ডে, দেখি ডজন হিসেবে বিক্রী করছে। বিহারেও দেখেছি গ্রামের হাটে পয়সা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে পালক ছাড়িয়ে ভেজে দেয়—গরম গরম। খেতে দারুণ লাগে।

কিশার গা গুলিয়ে উঠল। কী প্রাণবন্ত পাখিগুলো। লোকটা তাদের ওড়া দেখলো না, হাওয়ায় তাদের নাচ দেখলো না, তাদের চিকন গলার স্বর শুনলো না, শুধু পালক ছাড়িয়ে ভেজে খাবার কথাই মনে হল ওর।

দূর থেকে রাইরাংপুর দেখা যাচ্ছিল। যখন ঢুকলো, তখন দেখলো বেশ বড়ই জায়গা। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের আলাদা মহল্লা বাজারের মধ্যে। ওদের বাড়িগুলো দেখলেই চেনা যায়। নাভির উপর গেঞ্জী গুটিয়ে, হাঁটুর উপর আণ্ডার-ওয়্যারহীন ফিনফিনে মিলের ধুতি উঠিয়ে গদীতে বসে আছে শেঠরা। আয়োকোনি যায়োকোনি করে কথা বলছে। বাণিজ্যে যে লক্ষ্মী বসত করে তা এরাই প্রমাণ করেছে। পিকুর সঙ্গে খুব মিল আছে এদের। এদের চোখে কখনও মেঘলা আকাশ, শালফুলের গন্ধ, পূর্ণিমার চাঁদ পড়ে না, যে সময়ে ঐ সব দেখা যেত সেই সময় নষ্ট না করে ওরা দু'পয়সা কামিয়ে নেয়। বিশেষত্ব আছে এদের। মনটাকে পুরোপুরি লক্ষ্মীকে নিবেদিত করেছে ওরা। তাই-ই লক্ষ্মী বাঁধা থাকেন ওদেরই ঘরে।

রাইরাংপুর হয়ে টাটানগরের পথে না-গিয়ে গরুমহিষিণীর পথ ধরল অরি। কিছুদূর পিচ রাস্তায় গিয়েই একটা কাঁচা লাল মাটির পথে এসে পড়ল। এঁকে বেঁকে চলে গেছে সে পথ। আধঘন্টা টাক গাড়ি চালাবার পর দূর থেকে শেষ দুপুরের উদ্ভাসিত আলোয় লোহার খনি দেখা গেল। পাহাড়ের গা কেটে লোহার আকর বের করছে। পাহাড়ের গায়ে ঘা-এর মত দেখাচ্ছে এ জায়গাগুলো। আলো পড়ে সোনার মত চক্‌চক্ করছে।

কিশা বলল, বাঃ, কি সুন্দর!

কিন্তু জঙ্গল কোথায়? জঙ্গল যে একেবারেই নেই। কিছু ইউক্যালিপটাস্ প্ল্যানটেশান্ আছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে; মাথায়। ইউক্যালিপটাস্ বনে পাখি বসে না। পাখির কোনো খাবার নেই বলে, বাসা বাঁধার অসুবিধে বলে। মনে হয়, মৃত বন। মন খারাপ হয়ে গেল অরির।

পিকু বলল, ইনস্‌পেক্‌শান্ বাংলোটা কোন্ দিকে?

দেখতে হবে। অরি বলল।

দূরে কয়েকজন কুলি-কামিনের সঙ্গে সঙ্গে ট্রাউজার-হাওয়াইন শার্ট পরা এক বাবুর দেখা পাওয়া গেল। তাঁর কাছাকাছি গাড়ি নিয়ে গেল অরি।

পিকু মুখ বের করে বলল, ইনস্‌পেক্‌শান্ বাংলোটা কত দূরে?

ইনস্‌পেক্‌শান্ বাংলো?

ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন।

তারপর বললেন, এখানে তো কোনো বাংলো নেই।

বলেন কি মশাই? আপনি জানেন না বোধহয়। আমরা খোঁজ তো নিয়েই এলাম। পিকু বলল, উত্তেজিত হয়ে।

ভদ্রলোক বাঙালী, ছেলেমানুষ; বললেন, বাংলো বলতে ঘনশ্যামবাবুর একটি গেস্ট-হাউস আছে। কোম্পানীর কাজে যাঁরা আসেন, তাঁরাই থাকেন।

পিকু অভদ্রর মত বলল, এই ঘনশ্যামবাবুটি কে?

ঘনশ্যাম মিশ্র। এই লোহার খনির মালিক।

আয়রন ওর যায় কোথায় এখানে থেকে? পিকু আবার শুধোলো।

টাটায় যায়। এখান থেকে যায় আর বাদামপাহাড় থেকেও যায়।

পিকু মুখ ঘুরিয়ে বলল, গাড়ি ঘোরাও অরিদা। তোমার বিসোইর রামবাবু একটি চিজ্। ভদ্রলোককে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিলে না?

পিকু অধৈর্য গলায় বলল, ঘোরাও ঘোরাও, হাঁ করে দেখছো কি?

অরি গাড়ি ঘুরিয়ে, মুখ বের করে বলল, থ্যাঙ্ক উ।

ভদ্রলোক হাসলেন। কিশার দিকে চেয়ে থাকলেন লাজুক চোখে।

বোধহয় ব্যাচেলার। অরিরই মত। তবে, বয়স অনেক কম। এই নির্জন জায়গায় টাকার জন্যে পড়ে আছেন। কিশার মৃত সুন্দরী বাঙালী মেয়ে বোধহয় অনেকদিন দেখেননি। কোলকাতার জন্যে মনটা নিশ্চয়ই হু-হু করে উঠল বেচারীর কোলকাতার লোক দেখে!

ভাবল, অরি!

কিশাও হেসে বলল, ধন্যবাদ।

ভদ্রলোক মুখ তুললেন, মুখে লাজুক প্রসন্ন হাসি।

বললেন, না না, কী আর করলাম?

তারপর বললেন, থাকবেন আপনারা? থাকুন না? স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন খুব ভাল হবে। আমরা তো নতুন মানুষের মুখই দেখি না। সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

কিশা বলল, দেখি, কী ঠিক হয়।

অরি গাড়ি এগোলো এবার।

পিকুকে উদ্দেশ্য করে বলল, তাহলে কি করা হবে?

পিকু বলল, ব্যাক টু রাইরাংপুর। রাইরাংপুরে বিয়ার কিনে গাড়িতে খেতে খেতে যাবো। শরীর একেবারেই কষে গেছে গাড়ির জার্নিতে। গরমও কম নয়।

অরি বলল, টুবুল কি জল খাবে? তাহলে জল খেতে পারে এখানে।

পিকু বলল, একদম নয়। রাস্তাঘাটের জল খাবে না। জল তো গাড়িতেই আছে। খেতে হলে খাক্।

অরি বলল, তা আছে। কিন্তু তা দিয়ে তো এখন চা বানানো যাবে। সে কি খাওয়ার মত আছে আর?

কিশা বলল, আমি কিন্তু জল খাবো অরিদা।

তবে চলো, ঘনশ্যামবাবুর গেস্ট-হাউসেই যাই। দেখাও হবে। বলেই, যেদিকে ঘর-বাড়ি দেখা যাচ্ছিল, সেদিকে চললো।

পিকু বলল, এখানে থাকব না, ঐ ছোকরা নতুন মুখ দেখতে পায় না বলেই কী থাকতে হবে নাকি? আমার বৌ ছাড়া কি আর নতুন মুখ পেল না? ছোঁড়াটা হ্যাংলা আছে। সময়ে বিয়ে না করলেই এরকম হয়।

অরি হেসে বলল, আমার না হয় বয়স গেছে; কিন্তু ওর তো আছে। ওকে এ কথা মানায় না। ও বেচারী কী দোষ করল? ভদ্রতা করে, একটা ভালো কথা বলল।

তা বলল, তবে যত ভদ্রতা, যত ভালোমানুষী সব মেয়ের মুখ দেখলেই গজায় কী না! কিশাকে দেখার আগে তো আমার কথার জবাবই দিচ্ছিল না।

কিশা বলল, এটা অন্যায়, ভারী অন্যায়। মিছিমিছি ছেলেটির পিছনে লাগলে কেন তুমি?

ওই বা আমার বৌয়ের পেছনে লাগতে গেল কেন ?

অরি আলোচনা এড়িয়ে গিয়ে বলল, ঐ দ্যাখো, ঐটাই বোধহয় গেস্ট-হাউস !

গেস্ট-হাউসটি ছোট্ট। অন্যান্য কোয়ার্টারের মধ্যেই। নিরিবিলি নয় এবং দেখতেও স্টাফ কোয়ার্টারের মতই। গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে গেল অরি। গিয়ে দেখল, ছোবড়ার গদীর উপর দুজন সর্দারজী পাগড়ী খুলে, ছিটের আণ্ডারওয়্যার পরে শুয়ে আছেন।

একজন লোক এগিয়ে এল ওর দিকে। বোধহয় খিদমদ্‌গার।

লোকটিকে বলল অরি, একটু ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পারো ভাই ? এইটেই বুঝি গেস্ট-হাউস ?

লোকটি বলল, হ্যাঁ। তারপর আপ্যায়ন করে বলল, থাকবেন ?

লোক আছে তো !

এরা তো ঠিকাদার। রোদে হয়রান হয়ে গেছে বলে ফাঁকা ঘরে পাখার নীচে ঘুমিয়ে নিচ্ছে একটু। আপনারা থাকলেই খালি করে দেব। বাবুর গেস্ট-হাউসে কত লোক থেকে যায়। এখানে তো থাকার অন্য জায়গা নেই। যে আসে এবং থাকতে চায় সে-ই থাকে। বাবু খুব দিল দরিয়া।

না, ভাই। থাকবো না আমরা, তুমি শুধু জল খাওয়াও একটু।

লোকটি যত্ন করে পরিষ্কার করে মাজা বালতিতে করে জল এনে গ্লাসে করে দিল। অরি আর কিশা খেল। টুবুলও খেল।

পিকু বলল, এসব জলে ব্যাক্‌টিরিয়া থাকে। আমি রাইরাংপুরে গিয়ে বিয়ার খাবো।

তারপর অভিযোগের গলায় বলল, তুমি এমন না অরিদা ! একবার মনে তো করাবে রাইরাংপুরে !

অরি বলল, ভুল হয়ে গেছে।

তোমার তো ঐ এক অজুহাত ! মিনিটে মিনিটে ভুল করছ আর বলছ, ভুল হয়ে গেছে।

সরি। অরি বলল।

পিকু বলল, এও আরেক মুখস্থ বুলি। তোতাপাখির মত আউড়ে যাও।

জবাবে অরি কিছু বলল না।

জল খেয়ে আবার রাইরাংপুরের পথ ধরলো ওরা। বেলা পড়ে এসেছে। বাংরিপোসি ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। ঘাটটা দিনে দিনে পেরলেই ভালো হত। কিন্তু আজ যে পূর্ণিমা। কালকের থেকেও সুন্দর দেখাবে রাতে। পাহাড়, বন। ভাবতেই ভালো লাগছে অরির।

একটা বাচ্চা ছেলে, টুবুলের মতই; রাস্তার পাশে খেলা করছিল ধুলোবালি নিয়ে। গাড়ির গতি কমিয়ে হর্ন বাজালো অরি।

ওকে দেখেই, ওর বুকটা ধক্ করে উঠল। একটা ঐরকম শিশুকে খুন করেছে তার গাড়ি। মনটা হঠাৎই আবার খারাপ হয়ে গেল। ছেলেটাকে কি দাহ করেছে ? ওরা কোথায় দাহ করে কে জানে ? ছেলেটির কি মা-বাপ দুইই আছে ? দিদি দাদা ? নাকি কেউই নেই ? অরি চুপ করেই রইল। একটু আগেই জল খেয়েছে। কিন্তু গলাটা শুকিয়ে এল।

রাইরাংপুর অবধি কেউই আর কোনো কথা বলল না।

রাইরাংপুর পৌঁছে আবার বিয়ার বিয়ার করে ক্ষেপে গেল পিকু। কিন্তু কোথাওই পাওয়া গেল না। একটা দোকান পাওয়া গেলো, তাও বন্ধ। অন্যটাতে বিয়ার নেই। বিয়ার ট্রাকে করে আসে, ডিজেলের অভাবে সময়মত আসেনি ট্রাক।

পিকু বলল, কোথায় বাংরিপোসিতে খেয়ে দেয়ে ঘুম লাগাতাম ডানলোপিলোর উপর, না তোমার গরুভয়ধী দেখতে এসে রোদে ভাজা হয়ে গেলাম। তাও যদি বিয়ারও পাওয়া যেতো।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, ছাতার জায়গা।

টুবুলের মুখ গরমে তেতে উঠেছিলো। রাইরাংপুরের আগে অবধি গরম ছিলো না, গরমটা লাগল ওখান থেকে গরুমহিষিণী যেতে। রাইরাংপুর ছাড়িয়ে বিসোই-এর দিকে গেলেই হয়ত ঠাণ্ডা হবে। ওদিকে এতক্ষণে বৃষ্টি নেমে গেছে বোধহয়।

অরি বলল, চা খাবে নাকি কিশা ?

কিশা বলল, কাম্পা-টাম্পা কিছু পাওয়া যাবে ?

অরি ছায়া দেখে গাড়ি রাখল একটা দোকানে। কাম্পা নেই ; ফান্টা পেল।

টুবুল বলে উঠল, দু নত্ থে নো, তু নোভা।

কিশা আর অরি হেসে উঠল। কিন্তু নোভা নেই এই দোকানে। ওরা দুজনেই ফান্টা খেল। অরি চা। পিকু গাড়ি থেকে নেমে পড়ে আশেপাশের দোকানে বিয়ার পাওয়া যায় কি না, মরিয়া হয়ে শেষ বারের মত চেষ্টা করে দেখতে গেলো।

অরি কিশাকে বলল, পিকুকে কোলকাতায় দেখলে তো বোঝা যায় না যে, ড্রিঙ্কস-এর জন্যে ও এমন পাগলের মত করতে পারে !

কোলকাতায় বোঝা যায় না মানে, আপনারা—যাঁরা বাইরের লোক তাঁরা বোঝেন না—আমাকে সবই বুঝতে হয়। শক-অ্যাবসর্বার আছে, তাই অন্য কারো গায়ে শকটা লাগে না।

ওদের চা ও ফান্টা খাওয়া হয়ে গেলো কিন্তু তখনও পিকু ফিরল না। একটু দেখে পিকু যেদিকে গেছে, সেদিকে গাড়ি নিয়েই এগোলো অরি। থামা গাড়ির মধ্যে বসে থাকতে গরম লাগছিল বেশ। একটু যেতেই দেখা গেলো পিকু ফিরে আসছে খালি হাতে।

হয়েছে। নিজের মনেই কিশা বলল।

কেন ? অরি শুধলো।

পেলে তাও কিছুক্ষণের জন্যে বাঁচা যেতো। বিয়ার পাওয়া গেলো না তার চোট এখন সইতে হবে। আমার তো বটেই; আপনারও।

না, না, পিকু ছেলে ভালো।

অরি মনে মনে বলল, তুমি যদি কাউকে ভালোবাসো, তাহলে তার কুকুর বেড়ালকেও ভালোবাসতে হবে। আর পিকু তো মানুষই একজন; অরির ভালোবাসার জনের স্বামী।

দরজাটা খুলেই, দড়াম্ করে জোরে দরজাটা বন্ধ করল পিকু। অরির উপর রাগ দেখাবার জন্যেই এত জোরে বন্ধ করল দরজাটা। নিজের গাড়ি হলে করতে পারত না; বুকে ধাক্কা লাগত।

কি হলো ? স্টার্ট করে অরি শুধলো।

হোপ্‌লেস জায়গা ! পিকু বলল।

অরি বলল, এবারে রওয়ানা হই বিসোই-এর দিকে ? কি বলছ ?

চলো। আর কী করবে ? বলল, পিকু।

যা ভেবেছিলো, তাই-ই রাইরাংপুর থেকে বেরোবার মিনিট দশেকের মধ্যেই বৃষ্টি-ভেজা বিসোই-এর রাস্তাতে এসে পড়ল ওরা; কিছুক্ষণ আগে বোধহয় বেশ জোর বৃষ্টি হয়ে গেছে। তখনও টিপ্‌টিপ্ করে পড়ছে। কী স্নিগ্ধ হাওয়া এখানে ! পথের উপর ঝরা ফুল, পাতা পড়ে রয়েছে। দু' পাশের রুখু মাটি, সতৃষ্ণ জঙ্গল সব বৃষ্টিতে চান করে ওঠাতে তাদের গা থেকে যুবতী শরীরের মত উষ্ণ ঝাঁঝালো গন্ধ উঠছে। এই গন্ধ কেবল বৈশাখের বৃষ্টিভেজা জঙ্গলের গা থেকেই বেরোয়।

টুবুল জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টিতে হাত ভিজিয়ে বলল, বিত্‌তি, বিত্‌তি।

পিকু ধমক দিল। বলল, হাত ঢুকিয়ে নাও টুবুল। এ্যাকসিডেণ্ট হবে।

'এ্যাকসিডেণ্ট' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই টুবুলের চোখমুখে একটা দারুণ ভয় আর আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল। ছেলেটা মাঝে প্রকৃতিস্থ হয়েছিল; আবার যেন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়লো।

গাড়ির স্টীয়ারিং-এ দু'হাত আর পথের উপর দু'চোখ রেখে অরি ভাবছিল, মানুষ কী রকম স্বার্থপর হয়। হয়ত পিকু একা নয়। হয়ত সব মানুষই এরকমই স্বার্থপর। অজানা মা-বাবার বুকের নাম-না-জানা একটা ছেলেকে গাড়িচাপা দিয়ে ফেলে যে মানুষটা পালিয়ে এল, ছেলেটা মরবার সময় তার মুখে একটু জল দিলো না, বাঁচাবার কোনো চেষ্টাই করলো না, আর সেই মানুষই তার নিজের ছেলে চলমান গাড়ির জানালা দিয়ে একটু হাত বাড়ালেই এ্যাকসিডেণ্টের ভয়ে শিউরে ওঠে !

দূর থেকে বিসোই দেখা যাচ্ছিলো।

পিকু বলল, সেই দোকানে একটু দাঁড়িও তো। বিনা কারণে এরকম ধাপ্পাবাজি করার কী মানে হয় একটু জিজ্ঞেস করে যাবো। সব মানুষই প্রয়োজন পড়লে, নিজেকে বাঁচাতে, নিজের স্বার্থে মিথ্যা কথা বলে, সেটা বুঝতে পারি; কিন্তু সম্পূর্ণ বিনা কারণে মিথ্যা কথা বলে কেন মানুষ ?

কিশা বলল, অরিদা আমার ভালো লাগছে না। এখানে আর দাঁড়বেন না। বাংরিপোসি চলুন একেবারে। সেখানে এতক্ষণ ব্যাপারটা জানাজানি নিশ্চয়ই হয়েছে। কোন্ ঝড়ের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে ভগবানই জানেন। অনেক বেড়ানো হলো এবারে। কাল সকালেই মানে মানে কলকাতার দিকে রওয়ানা হলে বাঁচি।

অরি বলল, পিকুর দিকে চেয়ে, কি করব ?

পিকু বলল, আমার কোন্ মতটাই বা খাটছে। যা তোমরা ভালো মনে করো।

অরি না দাঁড়ানোই ভালো মনে করল। বিসোই-এর দু'পাশের দু'সারি দোকানের মাঝ দিয়ে, চওড়া বৃষ্টিভেজা পিচের রাস্তায় টায়ারে পিচপিচ শব্দ তুলে গাড়িটা জোরেই বিসোই পেরিয়ে এল।

অরি রামবাবুর কথা ভাবছিলো। ওর কিন্তু তত অবাক লাগছিল না। ভাবছিলো, আসলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একজন করে রামচন্দ্র মিশ্র লুকিয়ে থাকে। কখনও কখনও সোচ্চার হয় সে। ইচ্ছাভরা ভাবনায় ভর করে মানুষ নিজে যা নয়, নিজেকে তাই-ই কল্পনা করে কিছুক্ষণের জন্যে নিজের কাছে এবং পরের কাছেও এক ক্ষণিক উচ্চতায় ও প্রাপ্তিতে, নিজেকে উন্নত ও প্রাপ্ত করে। যা আমাদের সাধ, আমাদের সাধ্য তার অনেকেই কম হয়। প্রত্যেকেরই। আমরা যে হেরে যাই জীবনের কাছে, প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে, ভাগ্যের কাছে, এই হারটা আমাদের মধ্যের আমিত্ব বড় সহজেও অবলীলায় স্বীকার করতে রাজী থাকে না। তাই যেমন সমুদ্রের জলে জলোচ্ছ্বাস ঘটে, গ্রীষ্মের হাওয়ায় হঠাৎ ঘূর্ণী, পাহাড়ী নদীতে হঠাৎ বান, তেমনই যা প্রত্যহর গ্লানিময়তার সাধারণ্যে স্বেদাক্ত নয় তেমন কিছু কল্পনায় বলে বসে, করে বসে; আমরাও মিথ্যার মাধ্যমে মুহূর্তের জন্যে অলীক উচ্চতাতে উঠি, পরমুহূর্তেই আবার তৈলাক্ত বাঁশের বাঁদরের মত নেমে আসি নিঃশব্দে আমাদের নিজ নিজ সমতলে।

এই মিথ্যেতে কোনো পাপ দেখে না অরি। কোনো দুষ্ট দোষযুক্ত নয় এই মিথ্যা। অসহায়, জীবনের হাতে, ভাগ্যের হাতে, স্তব্ধ; বঞ্চিত সব স্তরের মানুষই মাঝে মাঝে স্বপ্নে পোলাউ রেঁধে ফেলে। অরির মতই !

অরি ভাবে, আহা ! কোনোদিন রামবাবু সত্যিই যেন একজন কেউকেটা হয়ে ওঠেন। যা তিনি চিরদিন হতে চেয়েছিলেন। বিসোইর দীন সাদামাটা পাইস হোটেলের মালিক নন। নগণ্যতার হাতে নিগৃহীত নিষ্পেষিত নন, এমন একজন মানুষ; যাঁকে থানায় ওয়ারলেস

করলে, কি পোস্টাপিসে কি রেলস্টেশানে ফোন করলেই লোকে সত্যিই দৌড়াদৌড়ি করে খবর দেওয়ায় জন্যে।

রামবাবু! অরি বলল মনে মনে। আপনি একা নন। আমরা সকলেই আপনারই মত। কল্পনাকে কিছুক্ষণের জন্যে আঁকড়ে না ধরে আজকের পৃথিবীর মানুষ বোধহয় বাস্তবে বাঁচতেই পারে না। কল্পনা ছাড়া কী মানুষে বাঁচে?

অরিই কি বাঁচত?

না। রামবাবু। আপনার দোষ নেই কোনো।

শ্বেতকেতুর পুতুলগুলি

বাংরিপোসির ঘাটে যখন এসে পড়ল গাড়িটা, তখন সূর্য নেই; কিন্তু আলো আছে, মৃদু। উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ আলো। কিশা চান করে বেরোলে কিশার মুখে যেমন আলো ফোটে।

অরি সাবধানে ঘাটটা পেরোলো!

কত কী ভেবেছিলো। ভেবেছিলো আজ পূর্ণিমাতে কিশার সঙ্গে আবার এই ঘাটে আসবে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একা দেখে মন ভরে না। যদি না সঙ্গে সেই সৌন্দর্য পরিপূর্ণভাবে অনুভব করার মত, তার সঙ্গে সমান করে ভাগ করে নেবার মত কেউ থাকে। এখন ঘাটটা থেকে নামছে গাড়িটা। আশ্চর্য! ঘাটের এদিকে একটুও বৃষ্টি হয় নি। নেমেই, বাঁকের মুখে এসেই অরির বুক স্তব্ধ হয়ে গেলো।

বাংলোর কাছ থেকে ধুঁয়ো উঠছে। এবং অনেক লোক লাঠি-সোঁটা তীর-ধনুক নিয়ে বাংলোর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

অরি গাড়িটা থামিয়ে দিল। পিকু দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। ঢেকে ফেলেই, মুখ নীচু করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল হঠাৎ।

কিশা পিছন থেকে বলল, অরিদা, ওরা কি চায়? ঐ লোকগুলো?

অরি অস্ফুটে বলল, বুঝতে পারছি না।

কিশা আতঙ্কিত গলায় বলল, ওরা কী আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বাংলোতে? ওরা কি পিকুকে মারতে চায়?

পিকু কথা না বলে এদিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল।

কিশা টুবুলকে বুকে জড়িয়ে ধরল। চেঁচিয়ে উঠল। বলল নাঃ নাঃ।

অরি বলল, ওরা এখনও দেখতে পায়নি আমাদের। তোমরা বরং নেমে যাও। একটু পরেই বাস আসবে রাইরাংপুর থেকে। তোমরা বাসে চেপে চলে যেও সোজা খড়গপুরে। রাতটা স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে থেকে কাল সকালে ট্রেন চলে যেও নির্বিঘ্নে কোলকাতা।

অরির হঠাৎ মনে হল, লোকগুলো চিৎকার করে উঠল। যেন এগিয়ে আসছে এদিকে। ওরা বোধহয় গাড়িটা দেখতে পেয়েছে।

পিকু ফুঁপিয়ে বলল, অরিদা, আমাকে বাঁচাও। প্লিজ আমাকে বাঁচাও, আমার বৌ আছে, বাচ্চা আছে, ওদের জন্যে আমাকে বাঁচাও। তোমার উপরেই সব। তুমি যদি বল যে তুমিই.....

প্রথমে অরির মনে হল, মারুক ওরা পিকুকে। মেরে ফেলুক। ওর মত নিষ্ঠুর দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের এমনি করেই মরা উচিত। ও মরলে কিশা আর টুবুল ভেসে তো যাবেই না; নোঙর পাবে। ও মরলে ভালোই হবে। পৃথিবীর ভালো হবে।

তারপর অরির মনে হল, ওর বুকের মধ্যে অনেকদিন থেকে. অনেকবছর থেকেই কীরকম জ্বালাধরা এক অভিমানের মেঘ জমে ছিল। ভাগ্যের হাতে, স্বার্থপর নীচ মানুষ-মানুষীর হাতে যে মার খেয়ে মরছে অনন্তকাল ধরে, ভালোবাসার মুখোশ পরে, শুভার্থীর জার্সি পরে, জীবনের এতগুলো বছর যে তাকে প্রচণ্ড নিগৃহীত করেছে অনেক হাত। সেসব নিঃশব্দ, অন্যের চোখে না-পড়া মারের চেয়ে এই সরল, সোজাসুজি সৎ লোকগুলোর মার বোধহয় অনেক ভালো। এদের হাতে তার এই অভিশপ্ত জীবন শেষ হয়ে গেলেই যেন ও সুখী হয়। বেঁচে থাকা মানে তো শুধুই টাকা রোজগার করা নয়, খাওয়া-পরা নয়, নিঃশ্বাস ফেলা নয়, বেঁচে থাকা মানে যে তার চেয়েও অনেক বড় কিছু!

অরি বোধহয় অবচেতনে এই-ই চেয়েছিল। ওকে বর্শা দিয়ে, টাঙ্গী দিয়ে, লাঠি দিয়ে ওরা টুকরো টুকরো করে ছিন্নভিন্ন, ক্ষতবিক্ষত করে দিক। হঠাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই ভর সন্ধ্যেতে ও আবিষ্কার করল যে, ও যেন প্রথম যৌবন থেকেই অপেক্ষমান ছিল, যেন এমনভাবে মরার জন্যেই ও এতদিন বেঁচে ছিল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল অরি দূরের লোকগুলোর দিকে চেয়ে।

কিন্তু কিশা কি বলে? তার বড় ভালোবাসার কিশা? কিশা কি তাকে মরতেই বলে?

কিশা। অরি ডাকল। খুব তাড়াতাড়ি:

তারপর অরি আর কিছু বলার আগেই কিশা বলল, অরিদা, ওকে বাঁচান, প্লিজ অরিদা।

অরির ঠোঁটের কোণে এক নৈর্ব্যক্তিক হাসি ফুটে উঠল।

মনে মনে ও বলল, বাঁচাব! বাঁচাব কিশা। তুমিও তো তাই চাও, তুমিও। তোমরা সকলেই একরকম। রুমি, তুমি। আশ্চর্য! তোমরা কেন এরকম?

আর কথা না বলে, অরি গাড়িটা গড়িয়ে দিল সামনে।

ওর হঠাৎ মনে হল, ওরা সকলেই একরকম। রুমি, কিশা...ওরা সবাই, ওরা নিজেরাই বাঁচতে জানে, অন্যকে বাঁচাতে জানেনা।

মুখে বলল, তোমরা কেউ কোনো কথা বোলো না। যা বলার, আমিই বলব। আমি লোকগুলোর কাছাকাছি পৌঁছেই গাড়ি থেকে নেমে যাব।

লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছিল এখন। কম করেও শ'খানেক লোক। আগুনের শিখা লক্‌লক্‌ করে লাফিয়ে উঠছিল। আঁচ ভেসে আসছিল হাওয়ায়। কালো ধুঁয়ো রাশরাশ, অন্ধকার হয়ে আসছে। গাড়িটা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে।

অরি যেন নিজের মনেই বলল, পারলে রুমিকে একটা খবর দিও পিকু।

ভাবলো, আরও বলে, ওকে বোলো যে, আমি একমাত্র ওকেই মনে করেছিলাম এই সময়ে, শেষ সময়ে। বোলো যে, আমি সত্যিই ভালোবেসেছিলাম ওকে। ওর মত অভিনয় করিনি ভালোবাসার। কিন্তু কিছুই বলল না মুখে। লাভ কি ? কি লাভ ?

গাড়িটা দেখেই লোকগুলো হৈ হৈ করে উঠল। গাড়িটা বাঁ দিকে রেখে অরি তাড়াতাড়ি নেমে যেতে যেতে বলল, ব্লু-বুকটা গাড়ির ড্যাশবোর্ডের পকেটেই আছে।

বলেই, নেমে দরজা বন্ধ করে, লোকগুলোর দিকে বড় বড় পা ফেলে চলে গেলো, গাড়ি আর লোকগুলোর মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রাখার জন্যে।

লোকগুলো লাফাতে লাফাতে অরিকে ঘিরে ফেলল। কালো ধুঁয়ো ওদের সকলকে ঘিরে ফেলল।

কিশা হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

টুবুল স্তব্ধ হয়ে ছিল প্রথম থেকেই।

পিকু চাপা ধমক দিল কিশাকে।

বলল, ন্যাকামি কোরো না। তোমাদের জন্যেই তো আমাকে এমন.... অরিদার কী ? একা লোক। বিয়ে-থা করেনি—শহীদ হওয়া সোজা....

তারপরই বলল, এমনিই মার-ধোর করলে ঠিক আছে, কিন্তু প্রাণে মেরে ফেললেই আর এক ঝামেলায় পড়তে হবে অরিদার ডেড বডি নিয়ে। কী ঝঞ্ঝাটেই না পড়া গেল ! বলেই, ফসস্‌ করে একটা সিগারেট ধরালো।

দূর থেকে কেবলি গোলমাল, উত্তেজিত চিৎকার, চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছিল। অরিকে আর দেখা যাচ্ছিল না।

অরিকে আর কোনোদিই দেখা যাবে না।

ভাবল কিশা।

অরি চান করছিলো। ব্যাপারটা যে এরকম মোড় নেবে, পিকু, কিশা অথবা অরি নিজেও ভাবতে পারে নি। আর টুবুল ?

ব্যাপারটা মিটে গেছে। পিকুর কিছু হয়নি। পিকুকে বাঁচাতে নিজের ঘাড়ে দোষ-নিতে-যাওয়া অরিরও কিছুই হয়নি ! পিকু খুব খুশী। কিন্তু অরি খুশী নয়। সেই ছেলেটা ! টুবুলের মত ছেলেটা ? সে তো গেছেই ! কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকজন নিরপরাধ মানুষও গেছে। একজন মহৎ মানুষ। পিকুর চেয়ে তো বটেই। অরির চেয়েও মহৎ।

একজন সর্দারজী ট্রাক ড্রাইভার। সে আসছিলো তার ট্রাক নিয়ে পিকু যে রাস্তায় ছেলেটিকে মাথায় চোট পাওয়া অবস্থায় পথের পাশে ফেলে নিজের প্রাণের ভয়ে পালিয়ে চলে আসে। সেই রাস্তা দিয়ে।

সর্দারজী বুঝেছিলো যে ছেলেটি গাড়ি চাপা পড়েছে। ছেলেটি রক্তের মধ্যে গরম পিচ রাস্তায় শুয়ে খাবি খাচ্ছিলো তখনও। সে তার ট্রাক থামিয়ে নেমে ছেলেটিকে যখন জল খাওয়াচ্ছিল সেই সময় সাইকেল করে যেতে যেতে একজন লোক তাকে দেখতে পেয়ে অন্যদের খবর দেয়।

হৈ-হৈ করে লাঠি নিয়ে লোকে তেড়ে আসে এবং সর্দারজীর কথা কিছুতেই বিশ্বাস করে না যে, ছেলেটিকে চাপা দেয় নি, শুধু মারাত্মক আহত ছেলেটিকে জল খাওয়াবার জন্যেই ট্রাক থামিয়ে সে নেমেছিল।

বেচারী সর্দারজীকে পিটিয়ে মেরে ফেলে গ্রামের লোকেরা। তার ক্লিনার কোনোক্রমে ব্যাক করে জোরে ট্রাক চালিয়ে পুলিশ চেকপোস্ট থেকে পুলিশ নিয়ে আসে। পুলিশ গ্রামের কিছু লোককে এ্যারেস্ট করতে যাওয়ায়, পুলিশের সঙ্গে গ্রামের লোকের মারামারি লেগে যায়। চারজন লাঠিধারী পুলিশ আহত হয়।

মৃত ছেলেটির মায়ের অবস্থা দেখে গ্রামের লোকদের মাথার ঠিক ছিলো না। একমাত্র সন্তান ছেলেটি, তরুণী গরীব মায়ের।

পুলিশ মার খাওয়াতে ও-সি আসেন জীপ নিয়ে। ধর-পাকড় হয়।

এদিকে পিকু কাল যেই সাপকে মেরেছিল, তারই জোড়া সাপটি বাংলোর গেটের উল্টোদিকে যে পুকুরটি আছে তার কাছে একজন মেয়েকে আজ দুপুরে তাড়া করে। দৌড়ে সেই মেয়েটি বাংলোর হাতায় ঢুকে পড়ে। সেই সাপটি হাতার মধ্যে তাকে তাড়া করে আসে। তখন পি-ডাবলু-ডির অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার সাহেবের অফিসের লোকজন লাঠি সোঁটা নিয়ে সেই সাপকে মেরে মেয়েটিকে কোনোক্রমে বাঁচায়। তারপর শুকনো পাতার রাশের মধ্যে মরা সাপটিকে ফেলে আগুন লাগিয়ে দেয়।

গ্রামের লোকেরা বলেছিলো যে, কালকের মরা সাপটাকে পোড়ায়নি ছেলেরা। তাই

আসলে সেই মরা সাপটিই বেঁচে কামড়াতে এসেছিলো মেয়েটিকে। এবং পিকুকে অবশ্যই কামড়াতো, যদি পিকু থাকতো।

ওরা আরোও বলেছিলো যে, ভগবান আছে। ভগবান না থাকলে হাতেনাতে ধরা পড়ে সর্দারজী! যেমন কর্ম। তেমনই ফল। তাকে মেরে একেবারে থেঁৎলে দিয়েছে ওরা।

লোকগুলো যখন সবে পুলিশের সঙ্গে হাঙ্গামা বাধিয়ে এসে উত্তেজিত অবস্থায় সাপটার কথা শুনে এখানে এসে আগুন জোরদার করে বাংলোর গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিলো ঠিক তখনই অরিরা ফেরে। টিব্বা সিংই ওদের বলেছিলো যে, সন্ধ্যে-সন্ধ্যের সময়ই ফিরবে ওরা। পিকুকে সাবধান করে দেবে ভেবেছিলো। আজ যেন সবাই সাবধানে থাকে রাতে। সাপের আত্মার কথা কিছুই বলা যায় না।

লোকগুলো অরিকে বলেছিলো, আমাদের যদি কিছু টাকা দেন তাহলে ভালো হয়। ছেলেটার সৎকার হয়নি এখনও। পুলিশ সর্দারজীর দেহ নিয়ে গেছে কিন্তু ছেলেটির দেহ ওরা নিয়ে যেতে দেয় নি। এক্ষুনি নিয়ে গিয়ে তেঁতুলতলায় দাহ করবে।

অরি একশ টাকা দিয়েছিল ওদের।

পিকুর জীবনটা, আর সেই টুবুলের মত ছেলেটা এবং সর্দারজীর জীবন বড় সস্তাতেই বিকোলো। তিনটে জীবন। ভাবছিলো অরি। চান করতে করতে।

বাইরে এখন এখানেও বৃষ্টি নেমেছে। বেশ মিষ্টি মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। চাঁপাফুলের গন্ধ লাগছে নাকে। খুব ভাল লাগছে। ভালোলাগার মতই রাত।

কিন্তু ছেলেটা! সর্দারজী! বেচারা!

অরি মনে মনে বলছিল, তুমি কত ভালো সর্দারজী। তোমার মত ভালো লোকদেরই এই পরিণতি প্রায়ই ঘটে বলেই বোধহয় ভালোরা চিরদিনই ভালো থাকতে পারে না। তোমার ক্লিনার, যে পুরো ব্যাপারটা নিজের চোখের সামনে ঘটতে দেখল, সে তার জীবনে আর কখনও কোনো মুমূর্ষু মানুষের মুখে জল দিতে দাঁড়াবে না। নিজে কাউকে চাপা দিলেও সেখানে আর একমুহূর্ত দাঁড়াবে না। কারণ ও জেনে গেছে যে, সংসারে নিজে ভালো হলেই সেই ভালোত্ব পরকে বোঝানো যায় না।

পিকুও বলেছিল, ইস্‌স্ ভগবানের কী দয়া!

অরি ভাবছিল, ভগবান এই গ্রামের লোকদের হাতে, বা পিকুর হাতে যতই কলুষিত হোন না কেন, ভগবানের অস্তিত্ব অনস্তিত্বে পর্যবসিত হয় না। এইটেই সুখের। কিন্তু ছেলেটা কী করেছিল? ঐ টুবুলের মত ছোট্ট ছেলেটা! ভগবান তুমি কি আছো? অরি নিরুচ্চারে শুধলো।

বাইরের বৃষ্টি চতুর্দিক থেকে যেন বলে উঠল, আছি, আছি, আছি! যা কিছু ঘটে, ভালো, মন্দ, মাঝামাঝি সবকিছুরই তাৎপর্য আছে। তাৎপর্যময়তার মধ্যে আমি নিহিত

আছি। আমি আছি এই ছেলেটির মৃত্যুতে, পিকুর স্বার্থপরতাতে, সর্দারজী ট্রাক ড্রাইভারের মহত্ত্বে, তোমার ব্যথায়, কিশার দ্বিধায়, আছি সাপের ছোবলে এবং গ্রামের লোকের সরল ভ্রান্ত বিশ্বাসে ! আমি চাঁপার গন্ধে আছি, বৃষ্টি-ভেজা বনের নিঃশ্বাসে আছি, কিশাকে চাওয়ায় তোমার যে যন্ত্রণা আমি তার মধ্যেও আছি। আমি ভালোতে আছি মন্দতেও আছি। সুখে আছি, দুখেও আছি। আমাকে যদি সত্যিই দেখতে চাও, তাহলে কিশার প্রতি তোমার ভালোবাসার চেয়েও গভীর, রুমিরও প্রতি তোমার অভিমানের চেয়েও গভীরতর কোনো তীব্র অনুভবে আমাকে চাইলে তুমি কখনও দেখতে নিশ্চয়ই পাবে। দেখতে না পেলেও আমি যে আছি একথা হৃদয়ে বুঝতে পারবে।

অরির মনে হলো ও ব্যাক ডেটেড হয়ে যাচ্ছে। কোনো আধুনিক মানুষ কী ভগবানে বিশ্বাস করতে পারে ? ভগবানে বিশ্বাস তো ড্রেইনপাইপ ট্রাউজারের মতই আউট অফ ফ্যাশান হয়ে গেছে।

অরি তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে বলল, চাই না, চাই না, বুঝতে চাই না। ভগবান আছে কী নেই জানতে চাই না আমি ! আমি একদিন রুমিকে বোঝাতে চাই যে, সে যা পেয়েছিলো আমার কাছ থেকে তার দাম বোঝে নি সে। যারা তার সমতলের, মানসিকতার, রসবোধের, শিক্ষার ; সে তাদেরই যোগ্য। সে আমার ভালোবাসার যোগ্য নয়, তাই তাকে আমি অনুকম্পা করি। রুমি বড় সস্তা। বড় সহজেই ওকে পাওয়া যায়। যা-তা লোকে ওকে পেতে পারে। ঘেন্না, ঘেন্না ; বড় ঘেন্না। ওর প্রকৃত স্বরূপ জানার পর ঘেন্না ছাড়া কিছুই থাকে না ওর জন্যে।

ভগবান আমি তোমাকে চাই না। আমি কিশাকে চাই। তুমি যদি কিশাকে আমার করে দাও এ জীবনের মত, চিরদিনের মত, তাহলে বুঝবো তুমি আছ। নইলে জানব, তুমি বুজরুকি, ফাঁকা আওয়াজ। তুমি সর্দারজীদেরই চিরদিন মেরেছো, আর বাঁচিয়েছো পিকুদের। তুমি দেখেছো রুমিদের আর ফেলেছো আমাদের। অরিদের। তুমি অসৎ, তুমি বোবা ; কালা। তুমি অভাগার কথা, গরীবদের কথা শোনো না। তুমি বুর্জোয়া, তুমি ক্যাপিটালিস্ট, তুমি ইন্‌সিনসিয়র, ভঙ্গীসর্বস্ব ; কৃত্রিমস্বরের কম্যুনিস্ট, তুমি মেকী, তুমি ভান ; তুমি মিথ্যা।

তোমাকে চাই না আমি। আমি কিশাকে চাই। যে কোন মূল্যে।

পায়জামা পাঞ্জাবী পরতে পরতে অরি গায়ে একটু সুগন্ধ লাগালো। রুমি তাকে দিয়েছিলো। অনেকদিন আগে। রুমিকে আদর করার সময় মাখবে বলে রেখে দিয়েছিলো। ঋতুর পর ঋতুতে, গ্রীষ্মে শীতে, বাষ্প হয়ে উড়ে গেলো সেই সুগন্ধ। একটু তলানি পড়েছিল !

আজ রাতে কিশাকে স্বপ্নে পাবে বলে মাখলো অরি।

রুমি বড় হিসাবী। অ্যাকাউন্ট্যান্টও। ট্রায়াল ব্যালান্সই মেলায় শুধু রুমি। অথচ জীবনের সব বড় পাওয়া, যত ইনট্যান্‌জিবল এ্যাসেটস্ তাদের অস্তিত্ব যে, ব্যালান্স শীটের খাঁচায় ধরা থাকে বা ধরা পড়ে না, এই কথাই জানে না রুমি। যা ধরা যায় বা ধরা পড়ে ও সেইটুকুই বোঝে, দেখতে পায়। যা তার চেয়েও বড়, যার দাম ট্যানজিবিলিটির মধ্যে নেই; তা ওর হিসাবেও নেই। ওকে উপহার দিলে ও উপহারের আর্থিক মূল্য বুঝে ধন্যবাদ দেয়, সেই উপহারের সঙ্গে যে হৃদয়ের উষ্ণতা মাখানো থাকে, তার দাম নেই রুমির কাছে কানাকড়িও। রুমি লেনদেনই বোঝে! লেনদেন ছাপিয়েও যা থাকে, যা চিরদিনই থাকে অমূল্য, মূল্যবান হয়ে; সেই মৃগনাভির খোঁজ রাখে না ও।

কিশা হয়ত রাখে। কিন্তু অরিকে কোনো মৃগনাভিই দেবে না কিশা। কিশার মৃগনাভি অরির জন্য নয়। কিশার নিজের হরিণ আছে—যাকে সে তার সব সুগন্ধ দেয়; দেবে। তার নাম পিকু। দোষ এবং গুণে মেশা পিকু। সে স্বামী। সমাজের পাসপোর্ট আছে তার সঙ্গে। গ্রাটিস্ ভিসা আছে কিশার শরীর মনে যাওয়ার, ইচ্ছে মত।

আর অরি ইল্‌লিগাল ইমিগ্রান্ট। কোনোই অধিকার নেই তার; এক কণাও না। তাইতো চাঁদের রাতে বা এমনি বৈশাখের বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যেয় অরি স্বপ্নে খেলতে নামে কিশার সঙ্গে মনের মাঠে ও প্রান্তরে, নিঝুম রাতে বনের জিন্ পরীদের মত।

জামাকাপড় পরে বারান্দায় বেরোলো অরি। গতরাতে যে চেয়ারে বসেছিলো, সেই চেয়ারটি টেনে বসল। ওরা স্বামী, স্ত্রী ও ছেলে এখন ঘরে।

পিকু এতদিন পৈতে পরেই ব্রাহ্মণ ছিল। আজকে যথার্থ দ্বিজ হলো। দ্বিতীয়বার প্রাণ পেয়ে। একগাল দাড়ি আর এক মাথা চুলওয়ালা সেই তরুণ অপাপবিদ্ধ সংসার-অনভিজ্ঞ সর্দারজী তার নিজের প্রাণের বিনিময়ে পিকুকে প্রাণ দান করে গেলো। নতুন প্রাণ। বড় খুশি স্বামী পিকু এবং বিশ্বস্তা, পতি-অনুগতা স্ত্রী কিশা তাই-ই বোধহয় এই দ্বিজত্ব সেলিব্রেট করছে রুদ্ধ ঘরে চাঁপা ফুলের গন্ধ-ভরা ফিস্‌ফিসে বৃষ্টির মধ্যে।

সিঁড়ির কাছে একটা ছায়া সরে গেল। চমকে উঠল অরি। টুবুলের মতো সুন্দর নয়, ইংরিজী স্কুলে পড়া নয়, কিন্তু টুবুলেরই মতো একটি ছোট ছেলে, কালো-কালো, গরীব গুরবো দুখিনী মায়ের একমাত্র সন্তান। সেই ছেলেটি কি? সে তো তেঁতুলতলায় ছাই হয়ে গেছে এতক্ষণ। না না, সে নয়। সে কেন হবে?

ভাল করে দেখল অরি। একটা রোগা কালো কুকুর। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কি যেন খুঁজছে, নাক দিয়ে মাটি শুঁকছে।

কি খুঁজছে ও। রুমির বুকের গন্ধ?

দুর বোকা! ও গন্ধ হারিয়ে গেছে, দূরত্বের কুয়াশায় মুছে গেছে; ধুয়ে গেছে যোগাযোগহীনতার বৃষ্টিতে। সে গন্ধ এখন অন্য পুরুষের নাকে কামড়ালে পাবি। সেই

পুরুষদের অরি চেনে, জানে। তারা রুমিরই স্ট্যাণ্ডার্ডের। রুমি তাদেরই যোগ্য। ছিঃ ছিঃ! কুকুর, বেড়াল; শেয়াল সব, অরির ভালোবাসার শব ঠুকরে খাচ্ছে। ওরা স্ক্যাভেঞ্জার। এঁটো-করা, বাসি, মরা-মানুষীর মাংস খায় ওরা। ওদের ঐ গন্তব্য। এটুকুই খা, খা, তোরাই কুরে খা। তোরা তো মাংস খেয়েই বেঁচে থাকিস্। মাংসর আড়ালে যে উষ্ণতা থাকে, মাংসল স্তনের আড়ালে যে হৃদয় বলে একটা ব্যাপার থাকে তার খোঁজ তোরা রাখিস না। তোরা খা রুমিকে—কামড়াকামড়ি করে খা, ছিঁড়ে খা শকুনের মত রুমির স্তনের নিটোল বোঁটা, নাড়িভুড়ি, নাক, চোখ, জরায়ু। জটায়ুর প্রেতের মত তোরা তোদের নখদন্তে ঠুকরে খা। যা! খাগে যা!

আঃ, কী সুন্দর গন্ধ হাওয়ায়। নিমফুল, করৌঞ্জ, চাঁপা, মহুয়া সব মিলে মিশে আজ চুল মেলেছে এই বৃষ্টি-ভেজা হাওয়ায়। রুমি এইসব গন্ধ ভুলে গেছে। রুমির প্রেমিকদের নাক বন্ধ। এই সব গন্ধ পায় না ওরা।

কিশা? তুমি কি করছ? তুমি কি এখন তোমার পুরুষসিংহ, উদার মহৎ স্বামীর চওড়া রোমশ বুকে নাক রেখে গদগদ হয়ে শুয়ে আছ? তোমার টুবুল কি ঘুমিয়ে পড়েছে? অন্য একটা টুবুল যে তেঁতুলতলায় ঘুমিয়ে আছে চিরদিনের জন্যে তার কথা বুঝি ভুলে গেলে? যাবেই; যাবেই। তুমিও তো একজন নারী। তোমরা তোমাদের স্বার্থপরতায়, কূপমণ্ডুকতায়, তোমাদের নির্লজ্জ অর্থহীন স্বামীপ্রীতিতে সব ভুলে যাও। ভিসাধারীদের তোমরা আমন্ত্রণ করো, প্রবেশ করতে দাও তোমাদের সুগন্ধি ইন্দ্রলোকের মসৃণ বনবীথিতে, আর যাদের ভিসা নেই, পাসপোর্ট পায়নি যারা, তারা দাঁড়িয়েই থাকে ঠাঠা রোদের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়ার সামনে। দাঁড়িয়ে থাকে, আর ঘামে; আর সূর্যের দিকে তাকায় আর ভাবে এই কাঁটাতারের বেড়া কে লাগিয়েছিল? কবে লাগিয়েছিল?

রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে-থাকা উত্তপ্ত মস্তিষ্কের মধ্যে কে যেন বলে ওঠে, মূর্খ! ভুলে গেলে? ভুলে গেলে তার নাম? তার নাম শ্বেতকেতু।

হ্যাঁ হ্যাঁ, উদ্দালকের ছেলে, শ্বেতকেতু; যে স্ত্রীজাতির সতীত্ব রক্ষার বন্দোবস্ত করেছিল বিবাহ প্রথা চালু করে। হাঃ হাঃ, শ্বেতকেতু! ইডিয়ট, ভণ্ড, জল্লাদ, মানুষ-মানুষীর মুক্তির পথের কালাপাহাড়।

অরি ভাবে, ও যদি বন্দুক চালাতে জানত, শ্বেতকেতুর মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিত অনেকদিন আগেই। অরি যে কিছু জানে না। ও মার খেতে জানে; মারতে জানে না। কেউ বেরিয়ে যাও বললে, মাথা নীচু করে বেরিয়ে যেতে পারে—যে বেরিয়ে যেতে বলে তাকে তারই ঘাড় ধরে সজোরে বের করে দিতে পারে না।

কিশা! তুমি কি করছ কিশা! এখনও চান করো নি? তুমি কি তোমার স্বামীর আদর খাওয়ার পর চান করতে যাবে? এই চান তোমাদের নারীদের জীবনের একটা বড় অধ্যায়।

এক পুরুষের সঙ্গে অন্য পুরুষের ব্যবধান। মাঝে শুধু চান। চান করলেই তোমরা শুদ্ধ, সতী; সুগন্ধি!

হাঃ হাঃ, শ্বেতকেতু। তোমার সনদ একটি হাইট্ অফ ইডিয়সী। আ পোস্ট ডেটেড চেক অন আ ক্র্যাশিং ব্যাঙ্ক। তুমি ব্যোপদেবের চেয়েও বড় ইডিয়ট। তোমার গালে বিক্রমাদিত্যের গল্পের ভাল্লুক থাপ্পড় মারে না কেন? কেন মারে না? স-সে-মি-রা। স-সে-মি-রা!

অরি ভাবল, ওর ভাবনাগুলো সব কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। ও নিজেকে নিজে কেবলই কনট্রাডিকট্ করে; করছে। এত পরস্পরবিরোধিতা ভাবনাতে চিন্তাতে, মানসিকতায় কি ঠিক? ও কি জানে না ও কি বলতে চায়, কি ভাবতে চায়; কি চায় জীবনে?

ঠিক তখনই, ওয়াল্ট হুইটম্যানের লাইট মনে পড়ে গেল অরির। ঠিক সময়েই মনে পড়ে। না, না, পরস্পর বিরোধিতাতে দোষ নেই কোনো, 'ডু আই কনট্রাডিকট্ মিসেলফ্? ভেরি ওয়েল দেন, আই কনট্রাডিকট্ মিসেলফ্!' ওয়াল্ট হুইটম্যান বড় প্রিয় কবি অরির।

শ্বেতকেতু, তুমিও কবি নও, আমিও কবি নই। কিন্তু তুমি ফাঁপা, সুপার-ফ্লপ; আমি সত্য, রিয়্যালিটি। শ্বেতকেতু, তুমি বহুদিন লোক ঠকিয়েছো, ডুগ্‌ডুগি বাজিয়েছো; এখন তোমার ডুগ্‌ডুগিটি বগলদাবা করে ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো। চোখে অপত্য স্নেহের কাজল মাখিয়ে, পুতুল খেলিয়ে, তুমি হাজার হাজার বছর মানুষ-মানুষীকে বঞ্চনা করেছো। পশ্চিমে ওরা তোমাকে ইতিমধ্যেই ঝাঁটাপেটা করে দেশ-ছাড়া করেছে—ওরা আর সতীত্বরক্ষার জন্যে বিয়েতে বিশ্বাস করে না—ওরা লিভ টুগেদার করছে। সনদবিবর্জিত সহবাস। একসঙ্গে থাকছে—ভালোবেসে, ভালোভেবে—তোমার শিকল ওরা আর পরছে না। বিয়ে যে একটা বন্ধন, একটা দাসত্ব, চোখ বাঁধা বলদের মতো ঘানিতে ঘুরে ঘুরে নিজেদের জীবন মরুভূমি করে অপত্য স্নেহের তেল তৈরি করা; তা ওরা বুঝে গেছে। যে-যুগে গোলা ভরা ধান ছিল, পুকুর ছিল, পুকুর ভরা মাছ ছিল, নারী ছিল পুরুষের বিলাসের, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাহীন মূক জীব, সেই যুগে তোমার সনদ চালু ছিল হয়ত, কিন্তু এ যুগে তামাদি হয়ে গেছে। বাতিল, বাতেল্লা এখন। আমরা ছিঁড়ে ফেলব তোমার সনদ। তোমার বিস্ফারিত চোখের সামনেই ছিঁড়ে ফেলব।

বাঃ, মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ উঠল। বৃষ্টি-ভেজা চক্‌চকে বন্ পাহাড়ের পটভূমিতে বৃষ্টি-ভেজা আকাশের ঝক্‌ঝকে চাঁদ। আর হাওয়াটা। কী সুন্দর গন্ধ হাওয়াতে।

অরি ডাকল, না-ডেকে; কিশা! ও কিশা! তুমি কি করছ ওঘরে? তোমাকে যে আমি নিরুচ্চারে কত ডাকি, কত নামে ডাকি, কতবার ডাকি, কতভাবে ডাকি, তুমি কি শুনতে পাও না? এখনও যদি না-আসো তো কখন আসবে? এসো, এসো, আমার পাশে

বসে সেই গানটা গাও তো দেখি। এক বসন্তোৎসবের রাতে শান্তিনিকেতনে মোহরদির গলায় গানটি শুনেছিলো অরি আজ থেকে কুড়ি বছর আগে, যখন ওর নিজের বয়স কুড়ি। এই কুড়ি বছরে ওর স্মৃতিতে গানটি কেবলই মধুরতর, প্রিয়তর হয়েছে। প্রতি বছরই তার অর্থ গেছে বদলে। তার ধার কমে গিয়ে ভার গিয়েছে বেড়ে। রবীন্দ্রনাথের গানের মানে শ্রোতার বিভিন্ন বয়সে বিভিন্নতায় বুঝি ভাস্বর হয়ে ওঠে মস্তিষ্কের আর অনুভূতির কোষে কোষে।

এসো কিশা। গাও না গানটা। রুমিও খুব ভালো গাইত। কিন্তু গানকে সে সত্তার মধ্যে গ্রহণ করে নি। অন্তরে নেয়নি। সে বাইরে যাওয়ার পোশাকের মত, স্বরলিপি মিলিয়ে, তাল, লয় ও সুরের মশলা বেটে গান গাইত। গান তার প্রাণের কেন্দ্রে ভরপুর হয়ে আপনা থেকেই গলা বেয়ে উঠে আসত না তার নূপুরের মত নিবিড় নাভি থেকে।

কিন্তু কিশা তা নয়। বাইরের প্রকৃতি, তার মনের মেঘ ও রোদ্দুর যাকে গান গাওয়ায়, সেই-ই তো গাইয়ে। যার মনের ভিতরটা ভরে গেছে, ভরে রয়েছে, তার ভিতর থেকে যা সহজে, বিনা আড়ম্বরে, বিনা অনুরোধে, তার নিজের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উপছে পড়ে; তাই-ই তো গান।

ও কিশা। এসো, এসো; সময় বড় দ্রুত যায়, শেষ হয়ে যায় জীবন। আর কতদিন? কতকাল তোমার জন্যে এমনি করে বসে থাকব আমি? ও হো, কোন গান, তাই বলিনি?

সেই গানটি। এই শেষ বসন্তের বিধুর জ্যোৎস্নাস্নাত সন্ধ্যেয় আর কোন গান গাইবে? সেই গানটিই গাওঃ 'তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে গোপনে —ফুলের গন্ধে বাঁশির গানে, মর্মমুখরিত পবনে, তুমি কিছু নিয়ে যাও বেদনাহত বেদনে যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন, সে বাণী নীরব নয়নে।'

তুমি কিছু দিয়ে যাও।

গাও কিশা। গাও। তোমার গান এই প্রাকৃতিক পরিবেশে আমাকে এবং তোমাকেও আমাদের সব ক্ষুদ্রতা, শারীরী দুঃখ, সব অপারগতা; অসহায়তা ভুলিয়ে দিয়ে এক অশরীরী স্বর্গীয় সুখে ভাসিয়ে নিয়ে যাক দুজনকেই।

গান যা পারে, তা যে শুধু গানই পারে। আমার হাতের ছোঁওয়া, চোখের চাওয়া, ঠোঁটের পরশ কিছুই যে তা পারে না। গান যা পারে।

গাও কিশা। আমার স্বপনচারিণী। আমার হৃদয়নন্দন-বনে তুমি গান গাও ধীরে ধীরে। এই ক্রমশঃ উজ্জ্বল হওয়া রাতের মতোই আমার বুকের অন্ধকার উপত্যকা উদ্বেল আলোয়, তোমার গানের নরম সুগন্ধি আলোয় ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে উঠুক।

গাও, কিশা; তুমি গাও।

পিকু বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলল, কি হল অরিদা তোমার মাইসীকে বলো গ্লাস ফ্লাস তো কিছুই দিলো না।

অরির স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলো। চমকে উঠে বলল, মাইসী নয়; মাউসী।

ঐ হলো। পিকু বলল।

তারপর বলল, আর হুইস্কি আছে না কি ? কালকের বোতলে তো সামান্যই ছিল। আই উইল গেট ড্রাঙ্ক টু নাইট। একেবারে সকালে উঠে তোমার পাশে বসব সীটে, —বসেই; ঘুমিয়ে পড়ব। মনের উপর দিয়ে যা ধকল গেলো। কতদিন যে লাগবে রিকুপ করতে, তা ভগবানই জানেন।

একটু চুপ করে থেকেই বলল, কি হলো ? মাইসীকে ডাকো।

অরি ডাকল, টিব্বা সিং।

টিব্বা সিং এসে দাঁড়াল।

বলল, আলু ভাজা হচ্ছে।

অরি বলল, তা হোক, তুমি সাহেবকে জলের জাগ, গ্লাস সব এনে দাও। তারপর আলুভাজা হলে নিয়ে এসো।

টিব্বা সিং চলে গেলে বলল, কিশা কোথায় ?

কিশা শুয়েছে। চান করে।

টুবুল ?

টুবুলকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছি।

ঘুমের ওষুধ ? কেন ?

অবাক হয়ে শুধোয় অরি !

চান করিয়ে দিল কিশা, তারপর নিজে চান করতে গেলো। আমি ঐ ফাঁকে দিয়েছি আস্ত একখানা ভ্যালিয়াম খাইয়ে। একেবারে সকালে উঠবে। মরার মতো ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু কেন ? অরি আবার শুধলো।

আরে, বাচ্চা ছেলে, বিশ্বাস আছে ? কখন কাকে কী বলে বসে। ওসব রিস্‌কে যাচ্ছি না আমি। বার বার সেই সর্দারজীর মত গডসেন্ট গ্যালাণ্ট, লোকেরা আমাকে বাঁচাতে নাও পারে।

কিশা জানে ? অরি শুধোল।

না। বলিনি তো। পিকু বলল।

যদি কোনো খারাপ এফেক্ট হয় ? এতটুকু ছেলে ! অরি আবার বলল।

এফেক্ট যতই খারাপ হোক, তার বাপ মরলে যা হত তার চেয়ে খারাপ তো কিছু হবে না।

ওঃ। বলল, অরি।

পিকু বলল, তুমি আবার কিশাকে বলতে যেও না। তুলকালাম কাণ্ড হবে। আজকে রাতে বৌকে একটু আদর করতে হবে। বুঝেছো। এমন একটা অকেশান, রি-বার্থ-এর অকেশান সেলিব্রেট করতে হবে না ?

অরি অস্ফুটে বলল, নিশ্চয়ই।

পিকু বলল, কোলকাতায় ফিরে তোমাকে খুব ভালো করে খাওয়াবো অরিদা একদিন—ফর, হোয়াট উ্য হ্যাভ ডান এণ্ড আন্‌ডান্ এজ ওয়েল।

অরি কিছু বলল না। চুপ করেই রইল।

টিব্বা সিং গ্লাস দিয়ে গেল। ঘর থেকে বোতলটা নিয়ে এল পিকু।

বলল, তোমার গ্লাসটা দেখো। টেল মী হোয়েন টু স্টপ্।

অরি বলল, আমাকে নয়।

তাহলে হবে না।

অরি শক্ত হয়ে বলল, না পিকু। আই ডোণ্ট ফীল লাইক। দিনে গরম ছিল, তাছাড়া আমি রেগুলার করি না।

এটা ঠিক হলো না। অতিথিকে কোম্পানী তো দেবে।

কাল দিয়েছিলাম। আজকে ক্ষমা কোরো। সত্যিই ভাল লাগে না।

নিজের গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে, পিকু হেসে উঠল নিজের মনে।

অরি ওর দিকে তাকিয়ে বলল, কি হলো ?

পিকু বলল, বল তো 'রেলিশ' মানে কি ?

রেলিশ মানে, রেলিশ।

পিকু বলল, বাঃ। খুব সাহেব তো তুমি। বাংলা মানে বলো।

রেলিশ মানে, ভালো লাগা। এনজয় করা।

পিকু বলল, তুমি একটা যা-তা ! রেলিশ-এর প্রতিশব্দ বাংলায় নেই হয়ত। থাকলেও, আমি জানি না। তবে, আমাদের স্কুলের মাস্টারমশাই চমৎকার করে বুঝিয়েছিলেন।

কি রকম ?

সানু জিজ্ঞেস করেছিল, স্যার রেলিশ মানে কি ?

উনি এক টিপ নস্যি নাকে দিয়ে বলেছিলেন, রেলিশ মানে জানিস না ? ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে একথালা ভাত খেয়ে, পথে সুন্দরী মেয়ে দেখে শীষ দিতে দিতে যেতে যেমন লাগে, তাকেই বলে রেলিশ করা।

অরি হেসে ফেলল। বলল, এর চেয়ে ভালো ব্যাখ্যা হয় না, কিন্তু স্কুলের ছাত্রকে এরকম করে মানে বোঝাতেন, কোন্ স্কুলের মাস্টারমশাই ? তুমি কোন্ স্কুলে পড়তে ?

সে কথা অবান্তর। পিকু বলল।

পিকু আজ খুব ভাল মুডে আছে। অরি ভাবল। কিছু একটা ভুলতে চাইছে ও। বিভোই-র রামচন্দ্র মিশ্র যেমন কল্পনার জগতে গিয়ে ভোলেন পিকুও তেমনই অতীতে চলে গিয়ে বর্তমানটাকে, এই দিনটাকে ভুলতে চাইছে।

অরি আবার বলল, জব্বর স্কুল তো তোমাদের। কোন্ স্কুল ?

পিকু বলল, হ্যারো, ইটন্ বা দুন স্কুল বা গোয়ালিয়র কিংবা আজমীরের স্কুল যে নয়, তা বুঝতেই পারছ, উত্তর কোলকাতায় আমাদের পাড়ারই স্কুল। নাম বলা যাবে না।

বলেই টকাস্ করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল পিকু। হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বলল, আজ কি রান্না হচ্ছে ? এ্যাই অরিদা ?

অরি বলল, সব কিনে আনব বলেছিলাম, আনা তো হলো না কিছুই। বৃষ্টি হওয়াতে ঠাণ্ডা হয়েছে। রাতে আরো ঠাণ্ডা হবে। তাই খিচুড়ি করতে বলেছি। খিচুড়ি আলুভাজা, ডিমভাজা এবং মুরগী, শুকনো করে।

তারপর বলল, দুপুরে তো তোমার খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা হলো। তাই চান করতে যাবার আগেই এসব বন্দোবস্ত করে গেছিলাম। মিষ্টিও দেখলাম খুবই ভালোবেসে খেলে ওখানে, তাই টিব্বা সিংকে দিয়ে আনিয়েছি।

পিকু বলল, বাঃ বাঃ। দাদা হো তো এ্যায়সা। তারপরেই নিজের মনেই আনন্দে টেবল বাজিয়ে হিন্দী সিনেমার গান গাইতে লাগল।

ততক্ষণে মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। চাঁদের আলোও বেশ জোর হয়েছে। বৃষ্টিভেজা পরিশ্রুত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ আলোর জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। পাগলা কোকিলটা আবার ডাকতে শুরু করেছে পাগলের মত। ওরা ফিরে আসার সময় সাপ আর পাতা পোড়ার যে কটু গন্ধটা ছিল, বৃষ্টির পর, চাঁপাফুল, করৌঞ্জ আর মহুয়ার গন্ধে এখন তা একেবারেই নেই।

অরি চুপ করে বসে থামের উপর দু'পা তুলে দিয়ে ভাবছিল নানা কথা। পিকু হুইস্কির মধ্যে, আর অরি ভাবনার মধ্যে বুঁদ হয়ে ছিল।

অরি মনে মনে ডাকল, কিশা ! তুমি এত দেরী করছ কেন ? কাল তো সারাদিন গাড়ির পিছনের সীটেই বসে থাকবে। কখনও সখনও রিয়ার ভিউ মিরারে তোমার সুন্দর আনত-চোখের আভাষটুকু দেখতে পাবো এক এক ঝলক ; তাও দিনের বেলা। অন্ধকার হয়ে গেলে তো সেটুকুও আর দেখা যাবে না। তারপর তো বাড়িতেই পৌঁছে যাবে তুমি। তুমি কী আমার কাছে একটু বসতে পারো না এসে, আমার সামনে ? তোমাকে একটু দেখলেও কি দোষ ? তাতেও কী তোমার আপত্তি ? শ্বেতকেতুর সনদের কোন্ অনুচ্ছেদের কোন্ ধারায় এ বাবদে বারণ আছে, শুনি ?

টকাস্ টকাস্ টকাস্ করে তিনবার শব্দ হল। গ্লাস, হুইস্কির বোতল এবং জলের জাগ রাখার।

অরি ভাবলো, আজও আবার কোনো চেঁচামেচি না বাধায় পিকু। এরকম কিছু কিছু ভদ্রলোককে দেখেছে ও, যাঁরা খেতে শুরু করলে টকাটক্ খান এবং থামতে জানেন না। তাঁদের এই মদ খাওয়ার মধ্যে কেমন যেন একটা আদিখ্যেতা আছে। আসলে মদই খায় ওঁদের, ওঁরা মদ খান না।

এমন সময় কিশা এল বারান্দাতে। একটা মাকড়সা-রঙ শাড়ি পরেছে। চাঁপাফুল গুঁজেছে চুলে। ফুলগুলো যদিও সকালের মত তাজা নেই আর। ফুলের গন্ধ, ওর গায়ে মাখা সাবানের গন্ধ এবং কোনো হালকা পারফ্যুমের গন্ধে সমস্ত বারান্দাটা সুগন্ধে, ম' ম' করে উঠল।

আশ্চর্য ভালোলাগায়, পুরোনো; তবু নিত্যনতুন বিস্ময়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল অরি কিশার দিকে। দিনের আলোতে, অথবা বারান্দাতে, আলোটা জ্বালানো থাকলে এত ভালো লাগতো না ওকে। এই আলো ছায়া, এই ভালো লাগা এই কল্পনা সব মিলিয়ে অরির মনোজগতের কিশা এক মনোহারিণী রূপে প্রস্ফুটিত হলো।

চেয়ার টেনে বসল কিশা অরির পাশে। বলল, টুবুলটা বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে। বোধহয় খাওয়াবার জন্যেও ওঠানো যাবে না। ভাগ্যিস, জামা-কাপড় ছাড়িয়ে চানটাও করিয়ে দিয়েছিলাম।

অরি মনে মনে বলল, থাক না কিশা। তোমার ছেলের কথা, তোমার স্বামীর কথা, তোমার স্বামীর বিপদাশঙ্কার কথা। এই-ই তো সারাক্ষণ বলছ কাল থেকেই। এবার থাক। তোমার স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে নিরপরাধ আমাকে পাঠিয়ে দিলে মরবার জন্যে। যা বললে, সবই তো করলাম। তবুও কী একটু অন্য কথা বলতে পারো না? একটু এই পরিবেশের কথা? আমার কথা?

অরি ভাবছিল, মানুষের সঙ্গ মানুষকে বড় বদলে দেয়। উদ্ভিদ জগতে একটা কথা শোনা যায় যে, আনারসের বনে যদি পেঁপেগাছ পোঁতা যায় তবে নাকি কিছুদিন পরে পেঁপের পাতা আনারসের পাতার মতই হয়ে যায়। হয়ত কথাটা সত্যি। যে চরিত্রের যে মানসিকতার সঙ্গীর সঙ্গে শ্বেতকেতুর নির্বন্ধে একজন নারী বা পুরুষ বেশীদিন থাকে, অজানিতে, অনবধানে সেই প্রথমজনের চরিত্রে অন্যজনের প্রভাব বড় বেশী করে পড়ে। এবং দুজনের মধ্যে যার চরিত্র দুর্বল, সে ক্রমে ক্রমে নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে অন্যের ছায়া হয়ে যায়। এটা বড় দুঃখের।

অরি নিরুচ্চারে বলল, কিশা! তুমি পিকুর মত হয়ে যাচ্ছো, হয়ে যাবে দিনে দিনে! তারপর একদিন আসবে, যেদিন তুমিও খুন করে পিকুর মত নির্বিকার থাকবে। ভাবলেও

কষ্ট হয়। এসব কথা না ভাবাই ভালো। তবে কিশাকে দু'তিনবছর আগেও যা দেখেছে অরি, কিশা আর সে কিশা নেই। যেহেতু স্বামী খাওয়ায় পরায়, যেহেতু স্বামীর সঙ্গে প্রতিদিন ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, প্রেমে হোক কী ঘৃণায় হোক এক খাটে শোয়, যেহেতু পিকু টুবুলের জনক, জননের যন্ত্র, সেহেতু তার সমস্ত মতকেই কিশা নিজের মত বলেই মেনে নিচ্ছে। কিশার কিশাত্ব আর সামান্যই বাকি আছে ; বোধহয় একেবারেই থাকবে না অদূর ভবিষ্যতে।

অরি যে কিশাকে ভালোবাসে, যে কিশাকে চায়, সে স্বতন্ত্র কিশা। বশংবদ, সংকীর্ণমনা, ছোট্ট জগতের পিকু চ্যাটার্জির স্ত্রীকে চায় না অরি। তাকে সে ভালোবাসেনি কখনও। ভালোবাসতে পারবেও না।

কিশা বলল, খাওয়া দাওয়ার কি হবে অরিদা ? কিছু তো আনাও হলো না, ওদের বলাও হলো না। আমি যাই গিয়ে দেখি।

অরি বলল, সব বন্দোবস্ত হয়েছে। তুমি একটুও উঠবে না। কাল তো সারাদিন পথেই যাবে। বোসো একটু গল্প করি।

পিকু বলল, আজও আরেকবার যাবে নাকি বাংরিপোসির ঘাটে তোমরা ? হুইস্কিটা বড় ভাল অরিদা। তাছাড়া, আঃ এত রিলিভড্ লাগছে। এত খুশী লাগছে যে কী বলব !

তারপর গলায় উদারতা ঝরিয়ে বলল, যাওনা যাও ; তোমরা আজও ঘুরে এসো একবার। কাল তো চলেই যাবো। আবার কবে আসা হয় না হয়।

কিশা বলল, না থাক। আমার কিছুই ভাল লাগছে না আর। কাল মানে মানে সকালে দুর্গা দুর্গা করে বেরিয়ে পড়তে পারলেই হয়। রাতে আবার কোনো গণ্ডগোল হবে না তো ? অরিদা ?

কি আর হবে ? অরি বলল।

মনে মনে বলল, একটি শিশু এবং দূর প্রদেশের একজন দাড়ি গোঁফওয়ালা সুশ্রী মানুষ সব গণ্ডগোলের হিসেব নিকেশ করে দিয়েছে। তারা ঘুমিয়ে পড়েছে চিরদিনের জন্যে—এ জীবনে পিকুর ঘুমের ব্যাঘাত যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করতে। গণ্ডগোল আর কি হবে ?

পিকুর স্বরটা আস্তে আস্তে জড়িয়ে আসছে। টিব্বা সিংয়ের নিয়ে আসা আলুভাজা এখন ও মুঠো মুঠো করে খাচ্ছে।

ও আবারও বলল, যাও না তোমরা ঘুরে এসো না। আজকের রাতটা বড় সুন্দর।

কিশা বলল, তুমিও চলো না। তারপরই বলল, কিন্তু সকলে গেলে টুবুলের কাছে কে থাকবে ? তার চেয়ে থাক। অরির দিকে ফিরে বলল, এ যাত্রা থাক অরিদা। আমার মনটাই অন্যরকম হয়ে গেছে।

অরি মুখে বলল, জানি। মনে মনে বলল, যত দিন যাবে, যত দীর্ঘদিন সহবাস করবে

পিকুর সঙ্গে ততই আরো অন্যরকম হয়ে যাবে। আমি জানি। তোমার জীবনটা দিনে দিনে একটা ঘর্মাক্ত অভ্যেস হয়ে যাবে। টুবুল বড় হবে, তার পড়াশুনা, পরীক্ষা, তার মানুষ হওয়া না-হওয়া, তার বিয়ে। তারপর একদিন দেখবে কিশা, তুমিও বুড়ি হয়ে গেছো। সব যুবতীরাই একদিন বুড়ি হয়, হবে। ভাবতেও খারাপ লাগে। তোমার টুবুলের স্ত্রী তোমাকে দজ্জাল শাশুড়ী বলে মনে করবে। জীবনে তুমি যা পাওনি, যা ইচ্ছে করে পাওনি বা যা পাওয়ার জোর তোমার ছিলো না সেই সব না-পাওয়ার দুঃখগুলি নতুন করে বাজবে তোমার বুকে, যখন দেখবে টুবুলের স্ত্রী তোমার চেয়ে অনেক স্বাধীন, তার এবং টুবুলের তোমাদের প্রতি মমত্ববোধ অনেক কম; তোমাদের যা ছিল সেই তুলনায়। তখন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে গালে হাত দিয়ে ভাববে, জীবনটাকে যদি গাড়ির মত ব্যাক গিয়ারে ফেলে আবার বাংরিপোসির বাংলোতো নিয়ে যাওয়া যেত, যদি, অরিদা, যা বড় আগ্রহের সঙ্গে দিতে চেয়েছিল একদিন তখন তা ফিরিয়ে না দিতে হত ভয়ে, অভ্যেস থেকে বাইরে আসার সাহসের অভাবে; তাহলে কতই না ভালো হত! স্মৃতি থাকত অন্ততঃ।

কিশা হঠাৎ বলল, তার চেয়ে চলুন অরিদা একটু পায়চারি করি সামনে। গাড়িতে বসে থেকে থেকে পা ধরে গেছে।

তারপরই বলল, সাপ-টাপ নেই তো!

পিকু বলল, বাঘের দেখা সাপের লেখা। তবুও টর্চটা নিয়ে যাও।

কিশা বলল, যাচ্ছি চাঁদের আলোয় হাঁটতে, টর্চ নিয়ে গেলে আর লাভ কি?

অ। পিকু বলল।

তারপর বলল, এজ উ্য প্লিজ! এনজয় ইওরসেলভস্!

কিশা উঠল।

বলল, চলুন অরিদা।

অরিও উঠল। অরির এখন আর ভালো লাগছিলো না। আবার সেই কনট্রাডিকশান। মনের মধ্যে ঝড়, একবার ভীষণ ভালোলাগায় দুঃসাহসী হয়ে চিরদিনের জন্যে কিশাকে পাওয়ার ইচ্ছা, আবার পরক্ষণেই বিরক্তি, দূর কি লাভ? কি হবে? কিশা তো পিকুরই। মিথ্যে এই আকাশকুসুম কল্পনা।

কি হবে নিজেকে আবার নতুন করে তাজা দুঃখ দিয়ে? রুমির দেওয়া ক্ষতে তো রক্তক্ষরণ একটু কমে এসেছে এখন, সেই ক্ষতে নতুন খোঁচা না-ই বা লাগাল নিজের হাতে! ওরা সিঁড়ি দিয়ে নামল। নেমেই বাঁ দিকে গেলো যেদিকে অনেকখানি ফাঁকা মাঠ। পিছনে বাংরিপোসির পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসা জঙ্গল।

এখন ভাল লাগছে। ওদের দুজনেরই। কোলকাতা থেকে জোর করে বেরিয়ে পড়লেই, দুদিনের জন্যে বেরিয়ে পড়লেও; ভালো লাগে। কী উদার পরিষ্কার আকাশ।

আওয়াজ নেই, চিৎকার নেই, লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষুণ্নিবৃত্তির কুৎসিত ব্যস্ততা নেই। এখানে তারারা শান্ত, স্নিগ্ধ। আকাশ আশীর্বাদক ! প্রকৃতি, ভালোবাসতে দেওয়ার জন্যে উন্মুখ আঁচল বিছিয়ে রেখেছে। এখানে কেউ কাউকে দেখে না, একটু নির্জনে এলেই চীনেবাদামওয়ালা বা ভিখারী এখানে নির্জনতাকে কদর্যতাতে পর্যবসিত করে না। এখানে যে-কোনো জায়গাতে এলেই জন ডানের কবিতা মনে পড়ে যায় অরির।

বারান্দা থেকে একটু দূরে এসেই, কিশা ফিসফিস করে বলল, আপনি ওকে ক্ষমা করবেন না জানি। আমি যদি আপনি হতাম তবে আমিও করতাম না। কিন্তু আমি যে ওর স্ত্রী, ওর ছেলের মা। আমার তো কোনো বিবেক নেই, ভবিষ্যৎ নেই আলাদা, ওর সঙ্গে আমি যে এক হয়ে গেছি।

অরি বলল, জানি তা !

কিশা হঠাৎ অরির ডান হাতটা নিজের হাতে নিল। চাপ দিল একটু।

বলল, আমি আপনাকে মরতে পাঠিয়েছিলাম ওর হয়ে। মৃত্যুর ক্লাসেও প্রক্সি চলে, জানা ছিলো না। এখন ভাবছি, কী করে পারলাম আমি। এত নীচ হতে।

একটু চুপ করে থেকে বলল, দুঃখের কথা এইটুকুই যে, আমি এও জানি যে, প্রয়োজন হলে আবারও ঠেলে দেবো আপনাকে। ওকেই আগলে রাখবো।

অরি হাসল। সামান্য শব্দ করে।

বলল, নিশ্চিন্ত থাকো। প্রয়োজন হলে সেবারের মত আমিই এগিয়ে যাবো। তোমাকে ঠেলে পাঠাতে হবে না।

তাও জানি। কিশা বলল। জানি তা।

একটু চুপ করে থেকে আবার ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, জানেন, তখন থেকে তাই-ই ভাবছি আমি। কেন গেলেন ? আপনি মরতে গেছিলেন কেন ?

অরি বলল, তুমি জানো না ? মুখে কি বলতেই হবে ? সব কথাই কি মুখে বললে ভাল শোনায় ?

জানি। কিশা বলল। মুখে বলতে হবে না। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে আপনার জীবনের দাম কী এতই কম ? ভয় করলো না আপনার ?

না ! অরি বলল।

না কেন ?

আমার যে হারাবার কিছুই নেই। আমার তো কিশা নেই, টুবুল নেই ; তাদের ভবিষ্যৎ-এর চিন্তা নেই। আমি ছাড়া তো আমার আর কেউ-ই নেই। ভয়, কার জন্যে ?

কিশা ওর হাত দিয়ে অরির বাহু জড়িয়ে ধরল। ঘন হয়ে এল অরির বুকের কাছে। অস্ফুটে বলল, এমন করে বলবেন না। আমার খুব কষ্ট...।

অরি হঠাৎ রুক্ষ গলায় বলল, কষ্ট তোমার একটুও হয় না। হলে তুমি...।

কিশা ফিসফিস করে বলল, হয়, কষ্ট হয়। কতখানি যে হয়; কী কষ্ট, তা বোঝাতে পারব না আপনাকে।

কিশা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল মাঠের মধ্যেই। বনের গাছ-গাছালির বৃষ্টিভেজা কাঁপতে-থাকা পাতা চাঁদের আলোয় চক্‌চক্‌ করছিলো। প্রসন্ন, উধাও, চাঁদওড়া রাত চারদিকে ঘিরে রয়েছে ওদের। রুপোঝুরি হাওয়া বইছে শাখায় শাখায়, ঘাসে ঘাসে ছায়া দুলিয়ে কানাকানি করে।

কিশা মুখ রাখলো অরির বুকে। দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল অরির পিঠ।

অরি কিশার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট রাখল, রেখে কিশার সব সৌন্দর্য, সব সুগন্ধ, নম্রতা; স্নিগ্ধতাশুদ্ধু সমস্ত কিশাকে শুষে নিতে লাগল। আর কিশা শোষিত হতে হতে জীবনে এই প্রথম জানতে পারল চুমু বলে যে একটা কথা আছে অভিধানে— যে শব্দটাকে ও এতদিন চিনতই, তার তাৎপর্য জানতো না। অরির শরীরের অণু-পরমাণু, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত; প্রতি রোমকূপে রোমকূপে ঝড় উঠল। কিশার হাঁটু দুটি অবশ হয়ে এল ভালোলাগায়, থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল সে। পড়ে যাবে এই ভয়ে সে আরো জোরে, আরো নিবিড়ভাবে অরিকে জড়িয়ে ধরল।

একটা সাদা লক্ষ্মী-পেঁচা ডাকতে ডাকতে উড়ে গেলো ওদের মাথার উপর দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে পিকু ডেকে উঠল— কি—শা।

চমকে উঠে, ওরা আলিঙ্গনমুক্ত করলো নিজেদের।

কিশা বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছিলো। উত্তেজনায় ওর বুক উঠানামা করছিল! অরি মুখ রাখলো ভীরু কবুতরীদের মাঝে। শান্ত করতে গিয়ে কবোষ্ণ কবুতরীদের আরো অশান্তই করে তুলল। সেই কবোষ্ণ মসৃণ সুডৌল আশ্লেষ, একটি স্বপ্নের মত; এই সুগন্ধি রাতের মতই লেগে রইল ওর ঠোঁটে; অরির সমস্ত সত্তায়।

অরি একাধিকবার আবিষ্কার করেছিল নিজেকে, এর আগে রুমির বুকে। জেনেছিল পুরুষ বেঁচে থাকে, পুনরুজ্জীবিত হয়, পরিশীলিত হয় ভালোবাসায় নারীর স্তনসন্ধিতে মুখ রেখে। অনেকদিন পরে আবার ও হঠাৎ জেনে আশ্চর্য হলো যে, ও এখনও বেঁচে আছে। মরে যায়নি এখনও। ও বাঁচতে পারে আবারও। কিশা। আঃ কিশা।

নিরুচ্চারে অরি বলল, নতুন প্রাণ দাও আমাকে। আমার শুকিয়ে যাওয়া ডালে ডালে ফুল ফোটাও, পাখি ডাকাও, প্রজাপতি আর কাঁচপোকা ওড়াও। কিশা, আমার কিশা। তুমি চিরকালের হও আমার, চিরজীবনের।

ওরা যখন বাংলোর সিঁড়ির কাছে ফিরে এলো তখন অরি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো। চাঁদের আলোতে বারান্দার থামের কালো ছায়াগুলো চওড়া বারান্দাতে এমনভাবে

পড়েছে যে, মনে হচ্ছিল বাংলোটা একটা কয়েদখানা। তার মধ্যে টেবলটা সামনে রেখে চেয়ারে ঝুঁকে বসে আছে পিকু। যেন জহ্লাদ। ফাঁসি দেবে এখনি কাউকে।

কিশা নরম পায়ে আস্তে আস্তে সেই বাঘবন্দীর ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল! বাইরের আলোতে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছিল অরির, তাই-ই বোধ হয় হঠাৎ বারান্দাতে ওঠাতে মাকড়সা-রঙা শাড়ি পরা কিশাকে আর দেখতে পেলো না।

শ্বেতকেতু নামের একটা বড় মাকড়সা ওকে গিলে ফেলল। কিশাকে আর খুঁজে পেলো না অরি।

কিশা যখন কথা বলল, তখনই আবার দেখতে পেল ও কিশাকে।

কিশা বলল পিকুকে, হঠাৎ অত জোরে ডাকলে কেন আমাকে?

ভয় পেয়েছিলাম। পিকু বলল।

অরি শুধলো, সাপ-টাপ?

পিকু চারধারে ভালো করে দেখে নিয়ে, ফিস্‌ফিস্ করে বলল, একটা ছেলে কাঁদছিলো; জল চাইছিলো।

কোথায়? অরি চারধারে তাকালো।

পিকু বলল, টুবুলের মত একটা ছেলে।

অরি ওর পায়ের একপাটি চটি হঠাৎই তুলে, ছুঁড়ে দিল বাইরে।

কুঁই-কুঁই করে কালো কুকুরটা ডাকতে ডাকতে লেজ গুটিয়ে পালালো।

অরি বলল, তুমি এই কুকুরটাকেই দেখেছিলে এবং ওরই ডাক শুনেছিলে। সন্ধ্যাবেলাতে আমি যখন একা বসেছিলাম, আমারও একবার ওরকম মনে হয়েছিল।

কিশা বলল, চটিটা? আমি এনে দেব?

অরি বলল, তুমি! না। পরের জুতোতে কেউ হাত দেয়? আমি যাচ্ছি।

অরি সিঁড়ি দিয়ে নামতে যেতেই দেখতে পেলো, দশ-বারোজন লোক বাংলোর গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকছে। তাদের দু তিনজনের হাতে বড় বড় লাঠি। আর লণ্ঠন।

ও থমকে দাঁড়াল। লোকগুলোকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি কিশাও এসে দাঁড়াল ওর গা ঘেঁষে।

পিকু অস্ফুটে কি যেন বলল, বলেই, চুপ করে গেলো।

লোকগুলো এগিয়ে আসছিল বাংলোর দিকে কথা না বলে। কিশা ওর ডান হাতটা দিয়ে খু-উব শক্ত করে অরির বাঁ হাতের কব্জী চেপে ধরল।

লোকগুলো আরো এগিয়ে এসেছে। নিঃশব্দ পায়ে। কোনো কথা নেই ওদের মুখে।

অরির মনে হলো, মৃত্যুর পায়ে বুঝি শব্দ ওঠে না কোনো, তীব্র আনন্দিত মুহূর্তের পর এমন হঠাৎই আসে সে। আনন্দ যে ব্যতিক্রমের; বরাবরের নয়, তাই বোঝাতে।

কিশা হঠাৎ বলল, যেতে দেবো না। আপনাকে যেতে দেবো না।

লোকগুলো বাংলোর প্রায় সামনাসামনি এসেই হঠাৎ বাঁদিকে বেঁকে চলে গেলো পি ডব্লু-ডির কোয়ার্টারগুলোর দিকে।

কিশার হাতের বাঁধন আস্তে আস্তে আলগা হয়ে এলো। ও পিছনে ফিরল। অরিও।

পিকুর কথা ওরা দুজনে ভুলেই গেছিলো। এই নাটকে যার ভূমিকা প্রধান সেই পিকু গে, লোকগুলোকে আসতে দেখেই দৌড়ে ঘরে চলে গেছিল তা ওরা লক্ষ্যই করেনি।

কিশা পিকুর শূন্য চেয়ারটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল।

বারান্দার আধো-অন্ধকারে কিশার মুখের অভিব্যক্তি দেখতে পেলো না অরি। ওর মুখে থামের ছায়া পড়েছিল। অন্ধকার।

অরি বসল, চেয়ার টেনে। কিশাও বসল পাশে। কেউই কোনো কথা বলল না।

কিছুক্ষণ পর পিকু সাবধানে পর্দা সরিয়ে বেরোল বারান্দায়। কিশার উপর তম্বি করে বলল, বলবে তো যে, ওরা চলে গেছে! কী রকম লোক তুমি!

কিশা জবাব দিলো না কোনো।

পিকু আবার বলল, কথা বললে কি জবাব দেওয়ার দরকার নেই?

কিশা পিকুর প্রশ্নকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে উঠে পড়ে বলল, দেখি রান্নার কতদূর হলো।

বলেই, উঠে চৌকিদারের ঘরের দিকে চলে গেলো।

পিকু আরও একটা হুইস্কি ঢালল। সিগারেট ধরালো। দেশলাইর আগুনে ওর মুখটা লাল হয়ে উঠেই নিভে গেলো।

যেখানে আগুনের আভায় লাল পিকুর ফর্সা চরিত্রহীন মুখখানি দেখা গেছিল মুহূর্তের তরে, সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বসে রইল অরি। উদ্দেশ্যহীন, বক্তব্যহীন; ভাবনাহীনভাবে।

ওর কিছুই ভালো লাগছিলো না।

বাদী-বিবাদী স্বর

কালকের মত আজও পিকু হুইস্কি খেয়েছিলো অনেকই শেষ অবধি। আজকে ওর অজুহাতও ছিল। যারা মদাপ তাদের রোজই একটা না একটা অজুহাত থাকে। সত্যি অজুহাত না থাকলে তারা কোনো অজুহাত বানিয়ে নেয়।

খেতে যখন বসল, তখন পিকু প্রায় বেহুঁশ। কিন্তু ক্ষিদে প্রচণ্ড। তবে খিচুড়িই খেয়েছিলো বেশী। আলুভাজা দিয়ে। মুর্গী খেতে যেটুকু মনোনিবেশের দরকার হয় তা দেওয়ার মত শারীরিক অবস্থা ছিলো না ওর। টুবুলটাকে ওঠানো যায়নি। কিশা আপসোস করছিল খাবার। ছেলেটা না খেয়ে রইল বলে। কিশা জানে না যে, ওকে ভ্যালিয়াম খাইয়েছে পিকু। কাল সকালেও কখন যে ছেলের ঘুম ভাঙবে, কে জানে? আস্ত বড়ি খাইয়েছে অতটুকু ছেলেকে!

পিকু খেয়ে দেয়ে বলল, গুড নাইট। ভেরী গুড নাইট টু ইউ টু। আমি শুতে চললাম। বলেই, ঘরে চলে গেলো।

খিচুড়িটা বেশ ভাল রেঁধেছিল মাউসী। মুর্গীটা তো খুবই ভাল।

কিশা আজ বড় যত্ন করে খাওয়ালো অরিকে। খাওয়া হয়ে গেলে বাসনকোসন নিয়ে যেতে এলো টিব্বা সিং।

অরি বলল, কাল ভোরে আমাদের চা দিও না। উঠে, চা চেয়ে নেব। সকলেই ক্লান্ত, কখন উঠি ঠিক নেই কোনো।

ও বলল, ঠিক আছে।

উত্তরটা কেমন সংক্ষিপ্ত শোনালো। বুকটা ধক্ করে উঠল কিশার। টিব্বা সিং কি পিকুকে সন্দেহ করেছে ? ওই-ই একমাত্র জানে যে, সকালে পিকু গাড়ি নিয়ে গেছিল সাপ মারার পর। টিব্বা সিংয়ের মুখের দিকে চাইল কিশা। কিছু বুঝতে পারলো না।

ঘরে মুখ ধুতে গিয়ে অনেকক্ষণ পরে বাইরে এল কিশা।

কিশা শাড়ি ছেড়ে নাইটি পরেছে। এসেই বলল, কিছু মনে করবেন না; গরম লাগছিলো। তারপর বলল, গুড নাইট অরিদা। কাল দেখা হবে।

অরি ওর দিকে তাকাল। শ্বেতকেতুর সনদ অনুযায়ী এই পোশাকের কিশাকে তার দেখবার কথা নয়। এই কিশা শুধুই পিকুর। পিকুর একার। মন্ত্র পড়ে, লোক খাইয়ে সানাই বাজিয়ে তবেই এই পোশাকে কোনো নারীকে দেখার অধিকার জন্মায় পুরুষের। পুরুষ পয়সা দিলে অবশ্য সবই পেতে পারে—কিন্তু পয়সার বিনিময়ে যা পাওয়া যায় তাতে অরি বিশ্বাস করে না। কোনোদিনও করেনি।

রুমি ! আঃ রুমি ! তুমি কি পয়সার বিনিময়ে আমাকে ভালোবাসতে চেয়েছিলে ? আমার জন্যে আমাকে কখনও ভালোবাসোনি তুমি, না ? একদিনও না ? তোমাকে বুঝিনি রুমি। এখনও বুঝি না।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অরি। ভাবছিলো, হুইস্কি খেলো পিকু, আর নেশা হলো ওর ?

কিশা বলল, কি ভাবছেন ?

অরি চমকে উঠে বলল, কি ভাবব, তাই-ই ভাবছিলাম।

কথা শুনে হেসে উঠল কিশা।

অরি বলল, ভাবছিলাম, এত দেরী করলে কেন ?

আরেকবার গা ধুলাম। শাড়ি ছাড়লাম। পিকুর বালিশটা আর বিছানার চাদরটা ঠিক করে দিলাম—বড় খারাপ শোওয়া ওর। টুবুলের মশারি ঠিকমত গোঁজা আছে কিনা দেখে এলাম।

অরি মুগ্ধ বিস্ময়ে কিশার দিকে তাকিয়ে রইল।

কিশা বলল, অমন করে তাকিয়ে আছেন যে ?

ভাবছি। ভাবছি যে আমার মা মারা গেছেন যখন আমি পনেরো বছরের। তারপর কেউ কখনও আমার শোওয়া ভাল না খারাপ, ঘুমের সময় মাথার বালিশ ঠিক থাকে না, সরে যায় তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। অন্য কারো জন্যে যে কেউ ঘামায়, তাও জানা ছিলো না।

কিশা হাসল।

বলল, বিয়ে করুন। যাকে করবেন, সে মাথা ঘামাবে।

অরি হাসল।

বলল, ভুল। বিয়ে করে নিজের জীবন ছারখার করেছে এমন অনেক পুরুষকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানি। সবাই-ই কি তোমার মত স্ত্রী ?

আমার চেয়ে অনেক ভাল সবাই। আমি জানি। অন্তত আপনার স্ত্রী তাই হবেন।

তারপরই বলল, কি ? করবেন না বিয়ে ? সময় বয়ে যাচ্ছে কিন্তু। এমন করে নিজেকে নষ্ট করছেন কেন ?

অরি বলল, সে-সব লোক ঘড়ি ধরে সকাল সাতটাতে চা খায়, আটটায় চান করে, সাড়ে আটটায় ব্রেকফাস্ট খায়, সাড়ে নটায় অফিস যায়, ছটায় বাড়ি ফেরে, সাড়ে ছটায় চান করে ! যারা প্রতি শনিবার সিনেমায় যায়, পায়ে দাঁড়িয়েই কোনোক্রমে এ্যাল্‌সেসিয়ান কুকুর পোষার মত স্ত্রী-পোষার ক্ষমতা হলেই একটা বিয়ে করে ফেলে, আমি তাদের দলে নই। শুধু বিয়ে করার জন্যেই বিয়ে করলে এতদিনে হারেম থাকত আমার। বিয়ে করতে হলে তো বৌ চাই। বৌ পেলাম কই ?

এত মেয়ে থাকতে বৌ পেলেন না ?

না ! যাকে পেলাম, সে আমার জন্যে অপেক্ষা করে নি। আমার সঙ্গে আলাপই হলো তার বিয়ের পর। যাকে বিয়ে করলেও করতে পারতাম, তেমন একজনকে।

কে সে ?

কিশা শুধলো। ভাব দেখালো যেন অরির কথা বোঝেনি।

অরি বলল, সে জানে, সে কে।

কিশা বলল, সে তো পিঞ্জরের পাখি। খাঁচার ফাঁক দিয়ে ঠোঁট বাড়িয়ে বড় জোর অন্য পাখির ঠোঁট থেকে বনের ফল বা ফুল নিতে পারে ঠোঁটে। তার অন্য খাঁচায় যাবার পথ নেই যে !

মুক্তিই যদি পাও তো অন্য খাঁচায় আবার ঢুকবে কেন ? তোমাকে আমি মুক্ত করেই রাখব। মাঝে মাঝে আমি বনের পাখির মত উড়ে আসব তোমার বনে। যতদিন ভালো

লাগবে, ততদিন থাকব, তারপর বিরক্তি আর একঘেয়েমি জন্মাবার আগেই আবার উড়ে যাবো। ফ্যামিলিয়ারিটি ব্রিডস্ কনটেমট্ ! ততক্ষণই থাকবো তোমার কাছে, যতক্ষণ ভালো লাগে। আবার উড়ে আসব যখন তুমি ঝরা পাতার চিঠি পাঠাবে বসন্তের হাওয়ায় অথবা কোনো আষাঢ়ের আকাশের পটভূমিতে উড়ে-যাওয়া কুন্দ শুভ্র বকের ঠোঁটে অথবা শরতের আলোর দ্যুতিতে।

কিশা বলল, আপনি বিয়ে করেননি বলেই বোধহয় বিয়ে নিয়ে এত সুন্দর করে বলতে পারেন, ভাবতে পারেন। বিবাহিত হলে আপনার এত সুন্দর মনটা, চোখদুটো নষ্ট হয়ে যেতো। অরিদা যদি তা না হতো তাহলে ভীষণ বিপদে পড়তেন আপনি। বিবাহিত জীবনে সুখ হতো না আপনার।

তোমাকে বিয়ে করলেও হতো না ? অরি বলল।

ইয়ার্কি করবেন না। মাথা টাথা খারাপ হয়ে গেছে আপনার। বার বার ওরকম করে বললে ঠাট্টা নয় বলেও তো মনে হতে পারে কখনও আমার।

ঠাট্টা ?

অরি গম্ভীর হয়ে উঠল।

বলল, ঠাট্টা একেবারেই নয়; কখনও ছিলো না।

কিশা বলল, আপনি সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বিশেষ কি আছে আমার অরিদা ? আমি যে সাধারণ অতি সাধারণ। অন্যসব মেয়ের যা আছে আমার তো তা থেকে বেশী কিছু নেই।

অরি বলল, মানুষ নিজে কি নিজেকে দেখতে পায় ! আয়নাতে শুধু চেহারাটাই চোখে পড়ে, সমস্ত মানুষটা কোনো আয়নাতেই ফোটে না। আমরা একে অন্যকে আমাদের চোখের আয়নাতে মনের আয়নাতে দেখতে পাই। তুমি জানো না, তুমি কী ! তোমার কি আছে। তা না-ই বা জানলে, তুমি আমার হও কিশা ! চিরদিনের, চিরকালের, এই জন্মের, সব জন্মের।

কিশা বলল, এরকম করলে আমি চলে যাব কিন্তু এক্ষুনি।

চলে তো যাবেই। চলে যাবার জন্যেই তো তুমি। এখন আর তখন। ভয় দেখিও না আমাকে !

একদম পাগল। কিশা বলল। বদ্ধ পাগল আপনি।

ঠিক এমনি করেই বলত রুমি।

রুমিও কি তবে ভালোবাসত ? ভালোবাসত অরিকে ? অরিরই জন্যে ?

কি হবে এখন ভেবে ? এখন ভাবার আর সময় নেই। ও গান আর গাস নে, গাস নে। যে দিন গিয়েছে চলে সে আর ফিরিবে না, তবে ও গান আর গাস্ নে !

অরি বলল, ভেবে দ্যাখো, ভালো করে ভেবে দ্যাখো। হয় না কেন ? কিসের বাধা তোমার ? সংস্কার, অভ্যেস, সমাজ বলে একটা নন একজিস্টেন্ট এন্‌টিটি এই-ই সব। শুধু এই-ই ? এই সবের জন্যে নিজের জীবনকে নষ্ট করবে ? আমার জীবনকে নষ্ট করবে ?

তারপরই বলল, কিশা। একথাটা কখনও জিজ্ঞেস করিনি আমি। তোমার মনের কথাটা। আমি শুধু আমার কথাই বলেছি। তুমিও আমাকে ভালোবাসো, তবেই শুধু একমাত্র আমার এই প্রার্থনার মানে হয়। নইলে মিছিমিছি নিজেকে ছোট করা ! নিজের কাছে, তোমার কাছে।

কিশা চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ পর বলল, মেয়েদের ভালোবাসার অনেকগুলো রকম আছে। দুঃখের কথা এই যে, পুরুষরা কেবল একরকমের ভালোবাসাই দেখতে পায়। কিন্তু আপনি তো অন্য দশজনের মত নন। আপনিও কেন দেখতে পান না।

কি ? অরি বলল অধৈর্যের মত।

বলো, তুমি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলে।

কিশা বলল, আপনিই না বলেছিলেন ? মুখেই কি সব বলতে হয় ? বলে মানুষ ?

তাই-ই যদি হবে। তবে কিসের বাধা ? অরি বলল।

কিশা বলল, অরিদা। আজকের এই রাতটাকে যা হয় না, হতে পারে না তেমন কিছু বলে ও ভেবে নষ্ট করবেন না। কাল সকালেই তো চলে যাব। তারপরই কোলকাতা। ভাবতেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। প্লিজ্।

অরি বলল, আর তোমাকে কবে এমন একলা করে এমন নিরিবিলিতে পাবো ? আর তো বলার সময় পাবো না। আমার যে বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে, দেরী হয়ে গেছে কিশা। আমার যে বেলা নেই আর।

কিশা চাপা হাসি হাসল। বলল, কিসের দেরী ? বিয়ের ? হঠাৎ-ই ভীষণ বিয়ে-পাগল হয়ে গেছেন তো দেখছি আপনি। আমার এক বন্ধুর দিদি আছেন। করবেন বিয়ে ? দেখতে বেশী ভালো না, তবে খুব ভালো ইলিশমাছ রান্না করতে পারেন আর পল্লীগীতি গাইতে পারেন। মানুষটি বড় ভালো। সিন্‌সিয়ার মানুষ। এরকম মেয়েকে বিয়ে করলেই আপনি সুখী হবেন। বলুন তো, কোলকাতায় ফিরেই আলাপ করিয়ে দিই।

অরি চুপ করে গেলো।

কথাটা কিশা ঠাট্টা করেই বলেছিল। কিন্তু অরি ঠাট্টা ভেবে নেয় নি।

অরি বলল, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি আমার জন্যে অনেক ভাবো। আমার বয়স হয়ে গেছে যদিও, তবুও আমার জন্যে বয়স্কা বা বিধবা বা ডাইভোর্সী তোমার মাসি-পিসী স্থানীয় কোনো পাত্রী দেখার দরকার নেই তোমার। ঐসব কথা থাক। একেবারেই

থাক। তার চেয়ে গান গাও একটা। গান শুনিয়ে, শুতে যাও। গান শুনিয়েই সতী স্ত্রীর মতো স্বামীর খাটে, স্বামীর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ো।

কিশা হাসল আবার। কিন্তু চুপ করে বসে রইল।

অরি বলল, আচ্ছা, একই লোকের সঙ্গে, একই খাটে, একই ঘরে, গরমে, শীতে, বসন্তে, বর্ষায় তোমার শুয়ে থাকতে ভালো লাগে ? দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে না ? জানো, রাতে যখন আমার লাইব্রেরীর ঘরের বারান্দায় এসে বসি— কোলকাতার লক্ষ বাড়ির লক্ষ ফ্ল্যাটের শোওয়ার ঘরের বাতিগুলো যখন এক এক করে নিবতে থাকে, কোথাও নীল বাল্ব জ্বলে ওঠে, কোথাও ছোট টর্চের আলো, আমার কেবলই এই কথাটা মনে হয়।

তারপরই বলল, আচ্ছা, সকালবেলা দাঁত না-মাজা দাড়ি না-কামানো, কেতুর-চোখের ঘেমো পিকুকে তোমার ভালো লাগে ? ইচ্ছে করে না খাট থেকে ঠেলে ফেলে দিতে ?

কিশা বলল, আপনি তো ডেঞ্জারাস লোক। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে, আমাকেও তাহলে আপনি খাট থেকে ফেলে দিতেন ?

অরি বলল, সিলি। তুমি বোকার মত কথা বলছ। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হতো শুধু ন-মাসে ছ-মাসে। একটা হট-লাইন থাকত। তুমি যখন আমাকে চাইতে আর আমি যখন চাইতাম তখন সেই লাইনে দুজনে কথা বলতাম এবং চলে আসতাম । বাঘেদের দাম্পত্য জীবন যাপন করতাম আমরা।

বাঘেদের দাম্পত্য জীবন ? সেটা আবার কি ? কিশা হেসে বলল।

তারপর নিজের মনেই বলল, সত্যিই কত কী-ই না জানেন আপনি। পাগল কি এমনি বলি আপনাকে ?

অরি বলল, জানো না ? জীব-জানোয়ারের জগতে বাঘই একমাত্র জীব যে একা থাকে। বাঘ এবং বাঘিনী দুজনেই। নিজের নিজের জগতে তারা সম্রাট আর সম্রাজ্ঞীর মত বাস করে। শরীর ছাড়াও যে জীবনে অনেক কিছু আছে, স্বাধীনতা, মুক্তি প্রকৃতির মধ্যেই অনাবিল আনন্দ এসব বাঘেরা জন্তু হয়েও যতটা বুঝল, আমরা বুঝতে পারলাম না।

কিশা বলল, একা থাকলে তাদের বাচ্চা হয় কী করে ? বাঘের জাত তো তাহলে এতদিনে উবে যেতো।

অরি বলল, সেই কথাই তো বলছি। বছরে দুবার। একবার গরমে আর একবার শীতে মাসখানেক মাসদেড়েকের জন্যে একসঙ্গে থাকে তারা। তখন শরীরের ক্ষিদে মিটিয়ে নেয়, খুশীর খেলা খেলে ওরা পাহাড়ী নদীর বালিতে, শিশির ভেজা মাঠে। তারপর যার যার স্বাধীনতা নিয়ে আবার ফিরে যায় যার যেদিকে মন চায়।

কিশা অবাক হয়ে বলল, সত্যি ! দারুণ তো !

দারুণ। দারুণ বলেই তো বললাম। অথচ আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান জানোয়ার হয়েও বাঘেদের কাছ থেকে কিছুই শিখলাম না

হঠাৎ কিশা বলল, আমি একটু আসছি, টুবুল ক দেখেই। মশারি-টশারি সব সুদ্ধ নিয়ে খাট থেকে পড়ে না যায়। ওর বাবার মতো খারাপ শোওয়া ওরও।

অরি ভাবছিল। ভাবছিল, শ্বেতকেতুর কথা। কী দারুণ চক্রান্তে লোকটা বেঁধেছে মানুষ-মানুষীকে। নিজেদের শরীর দিয়ে করা খেলনা ধরিয়ে দিয়েছে হাতে, মশারি দিয়েছে, জোড়া খাট দিয়েছে, হার্ট এ্যাটাক হওয়া শাশুড়ী দিয়েছে, ডায়বেটিক্ শ্বশুর, ননদ, দেওর, জা, শালা, শালী, শালাজ, ভায়রা ইত্যাদি গুচ্ছের ভূষিমাল দিয়ে চড়িয়ে দিয়েছে জীবনের নাগরদোলায়। একই খাট থেকে উঠতে নামতে জীবন শেষ। জীবনের মানে কি ? যৌবনের মানে কি ? স্বাধীনতার মানে কি ? কিছুরই মানে বোঝার সময় দেয়নি শ্বেতকেতু। ছেলে ডাকছে মা ! মেয়ে ডাকছে বাবা, শ্বশুর ডাকছে বৌমা, শালী ডাকছে জামাইবাবু, দেওর ডাকছে বৌদি, স্বামী ডাকছে এই যে শুনছ, আমার তোয়ালেটা ! এই সব ডাকাডাকির গোলমালে অরির ডাক কিশা শুনবে কি করে ?

অসম্ভব। নাঃ কিশা। তোমার মুক্তি নেই। মুক্তির সংজ্ঞাই তোমার অজানা। পুতুল খেলেই কাটিয়ে দাও জীবনটা। তুমি আর মানুষ নেই। পুতুল খেলতে খেলতে তুমিও পুতুল হয়ে গেছো। স্বামী সম্বন্ধে তোমার এতরকম এবং এত গভীর অনুযোগ অভিযোগ তবুও তুমি পারো না। পুতুল হাতে ছোট্ট মেয়ের মত মুগ্ধ চোখে রথের মেলার নাগরদোলার দিকে আবিষ্ট হয়ে চেয়ে আছো এখনও।

যদি..

কিশা ফিরে এল।

বলল, কি ভাবছিলেন ?

ঐ দিকে তাকাও। অরি বলল। ঐ যে চাঁদের আলোয় ভরে যাওয়া মাঠটাতে, পাগল কোকিলটার ডাকের মধ্যে, ঐদিকে তাকাও একবার।

তাকিয়েছি। কিশা বলল। এবার বলুন, কি ?

ঐখানে তোমার জন্য বাড়ি করব একটা—মুসলমান নবাবদের বাড়ির ঢঙে।

ঐখানে ? কিশা শুধলো। হাসতে হাসতে।

খুব মজা পেয়েছে ও। অরির অন্তরের আর্তিতে খুবই মজা পেয়েছে এই গভীর রাতের সতী-স্বাধ্বী পরস্ত্রী !

আহা ! অরি বলল, ঐখানে না হয়, অন্য কোনোখানে,এই পৃথিবীরই কোনো সুন্দর

জায়গায়, যেখানে এইরকম আকাশ, এইরকম শান্তি, নির্জনতা, পরিসর; তেমন কোনখানে। বাড়ির বাইরেটা হবে কালো পাথরের আর ভিতরটা সাদা মার্বেলের, বুঝলে ? বিজলী বাতি থাকবে না। কিন্তু গরম লাগবে না তোমার। এমন বন্দোবস্ত করব যে পাহাড়ের ঝর্ণার ঠাণ্ডা জল কুলকুল্ করে তোমার ঘরের মেঝের তলায় জাফ্‌রী দিয়ে বয়ে যাবে অবিরাম। আর রুপোর ঝালর দেওয়া টানা-পাখা। মিশরের এ্যান্টিকের দোকান থেকে নিয়ে আসব তোমারই জন্যে।

কিশা হাসছিল। বলল, বলুন, তারপর ?

অরি বলল, এইরকমই কোনো চাঁদের রাতে তুমি এসে বসবে জাফ্‌রী দেওয়া সাদা বারান্দাতে। ইরানী গালচের উপরে। সারেংগী আর রবাব নিয়ে আসবে ওরা। মখমল-এর ওয়াড় খুলে বের করবে। তুমি সুনিদ্রা রাগে আলাপ করবে আস্তে আস্তে আর আমি পাশে বসে গড়গড়ায় অম্বুরি তামাক খাবো।

রাত আরো বেশী হলে তুমি ধরবে কদরপিয়ার ঠুংরী। শেষ রাতে ভৈরবী। তখন পুবের আকাশে লালচে আভা লাগবে তোমার গানে গানে।

আমি আর তুমি যখন খেতে বসব রাতে, তখন রোশন চৌকি বাজবে। আমরা যখন শুতে যাবো তখনও আমাদের শাহীমহলের চারধারে ঘুরে ঘুরে বাজাবে ওরা। সানাইয়ের সুর শুনতে শুনতে তোমায় আদর করব আমি। তুমি আমায় আদর করবে।

সন্ধ্যে হতে না হতে তুমি পরবে বড়ো বড়ো ঘেরওয়ালা পাঁয়চার কলীদার পায়জামা। কোমরের কাছে চাপা। বুকের উপর থাকবে ছোট্ট ও সরু আস্তিনের টান-টান আংগিয়া। পেট আর পিঠ ঢাকা থাকবে কুর্তিতে। মিহি কাপড়ের আধা আস্তিনের টাইট বক্ষাবরণী বা শলুকা পরবে তুমি। তোমার নাকে থাকবে সোনার কীল। তুমি কটাক্ষে চাইবে আমার দিকে। আমার বাঘিনী বেগম কিশা। মিলন কালের কিশা।

যে পালংকে শোব তুমি আর আমি, তার মাথার দিকে নরম পাতলা পাতলা টুল কাপড়ের তাকিয়া থাকবে। সাদা নয়নসুখ মস্‌লিনের ওয়াড় পরানো থাকবে পরতের মত, উপর উপর। তার উপরে ওদিকে ঐ কাপড়েরই দুটি গলতাকিয়া থাকবে।

গল্‌তাকিয়া কি জানো ? তুমি যখন ডান পাশে ফিরবে তখন তোমার গাল আর বালিশের মধ্যে রাখবে একটা—বাঁয়ে ফিরবে যখন তখন গালের নীচে চেপে রাখবে আরেকটা ! যাতে গালে দাগ না-হয়, চোখে চাপ না পড়ে। গল্‌তাকিয়ার মাপ হবে ঠিক তোমার করতলের মতো।

বিছানার দুপাশে, ধারের দিকে দুটো শাল তকীনিয়া থাকবে। পাশ ফেরার সময় আমার না-দেখা তোমার সুন্দর জানুর নীচে রাখবে তুমি তাদের। আরাম হবে।

তোমাকে কী কষ্ট দিতে পারি আমি !

প্রথম শীতে, যখন ঠাণ্ডা থাকবে মিষ্টি মিষ্টি, তখন পায়ের কাছে থাকবে দুলাঈ। বেশী শীতে থাকবে রজাই—আতর মাখানো। আবীর আতর।

তোমার না-দেখা শরীরের গন্ধ মিশে যাবে সেই আতরের গন্ধে।

তুমি যখন নাচ দেখাবে আমাকে, শুধু আমাকেই, তখন তোমার কালো নরম চুল, যে চুল তুমি কাঁধের উপর ফেলে উদাস চোখে চেয়ে থাকো, তা আর দেখা যাবে না তখন। রঙীন দু-পাট্টার মূবার বেঁধে, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে, মাথা থেকে তোমার সরু কোমর পর্যন্ত এনে পাকিয়ে, আটকে দেবে তোমার ব্যক্তিগত খিদ্‌মদ্‌গারির সুন্দরী তরুণী মেয়েটি। সেই-ই তোমাকে চান করাবে নিজে হাতে। আর কখনও কখনও আমি নিজেও। যেমন বলেছিলাম কাল, তেমন করে।

সেই দু-পাট্টার মূবার উপর চওড়া রুপোর লেস্ লেপটে দেবে। সেই লেস্ তুমি দেখেছো ? তাকে বলে লচ্‌কা। নাচের ভঙ্গীতে, ছন্দে, তোমার শরীরে দোলা লাগলে তখন মনে হবে যে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটি বড়ো ভারী মোটা রুপোর বিনুনীই পরেছো বুঝি তুমি। আর মাথায় থাকবে মেহরাদার করবী। তার মাঝখানে কয়েকটি আল্‌কা-তিল্‌কা আশেপাশে রুপোলী চূর্ণ। আর হাতে পায়ে থাকবে মেহেদি।

কিশা হঠাৎ বলল, আপনি আমার কাছে সরে আসুন। আমার ভয় করছে।

কেন ? ভয় করছে কেন ? অরি বলল।

ভয় করবে না। ভালোলাগাও ভয় ধরিয়ে দেয় সময় সময়। এত ভালোলাগা কখনও জানিনি আগে। এত ভালো কি সইবে আমার ?

কিশা অরির খুব কাছে এসে বসল। অরি তার ডান হাতে জড়িয়ে ধরলো কিশাকে। কিশার বাহু, বুক সব ঘিরে, সমস্ত কিশাকে ঘিরে রইল অরির ভালোবাসার হাত।

কিশা বলল, বলুন, বলুন থামলেন কেন ?

অরি বলল, আমি জানি না তুমি কী খেতে ভালোবাসো। কিন্তু খাওয়ার সময় তোমাকে দেখাবো পুলাউ-এর বাহার, তুমি মাউসীর খিচুড়ি খেয়েই আহা আহা করছো—তোমাকে যত্ন করে খাওয়াবো আমি। আরেঃ তুমিই তো খাওয়াবে আমাকে। তুমিই তো মাল্‌কিন হবে আমার সাম্রাজ্যের।

গুলজার পুলাউ, খুর পুলাউ, কোকো পুলাউ, মোতী পুলাউ, চম্‌বেলী পুলাউ। আরও নাম শুনবে ? শোনাতে পারি তাও।

দস্তরখানের উপর সুন্দর করে সাজিয়ে আনবে ওরা। উম্‌দা খুশবু বেরুবে সেই ধুঁয়ো ওঠা পুলাউ থেকে। পুলাউ যদি ভালো না লাগে তাহলে খুশকা খেও, নয়ত চালের গুলাত্‌থী।

আনারদানা পুলাউও খাওয়াবো তোমাকে। প্রত্যেকটা চাল আদ্ধেক লাল, আদ্ধেক

সাদা—মনে হবে মণিরত্ন সাজানো আছে দস্তরখানের উপর। কিংবা নওরতন পুলাউ খাবে ? নবরত্ন পাথরের মত নটি রঙের চাল মিলিয়ে।

কত কী-ই আছে কিশা। এই একটা জীবন নিয়ে কত কী করার আছে।

বিবাহিত জীবন মানে আণ্ডারওয়্যার পরা পিকুর পাশে রাতের পর রাত শুয়ে থাকা নয়, জীবন মানেই শুধু কাজ, শুকনো কর্তব্য, স্বামীর অফিস টাইম, ছেলের স্কুল নয়; জীবন মানে তোমারই জীবন। আমার দেওয়া সেই উদার খোলা-হাওয়ার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে চুল খুলে। আমি দূর থেকে ডাকব কি—শা। তুমি ডাক শুনে দৌড়ে আসবে আমার বুকে। রাণীর জীবন, বেগমসাহেবার জীবন দেব তোমাকে আমি।

তুমি যে তুমিই, তুমি যে আমার কিশা। এই জন্যেই তোমাকে সমস্ত প্রাপ্তিতে সুপ্রাপ্ত করব। কিশা ছাড়া, আমার বুকের মধ্যের, আমার মনের মধ্যের সমস্ত কিশা ছাড়া আর কিছুই হতে হবে না তোমাকে।

কোনো বৈশাখী দুপুরে যখন হু হু করে রুখু মাঠে উদাসী হাওয়া বইবে হলুদ লাল ঝরা পাতা উড়িয়ে যখন আজকের মতই পাগল হবে কোকিলগুলো; তেমন দিনে, গোলাপজল মেশানো ঝর্ণার জল-বওয়া তোমার বসার ঘরে আমি আর তুমি বসে বটের লড়াই দেখব।

বটের পাখি দেখেছো কখনও ? এই জঙ্গলে নেই, বিহারে, উত্তরপ্রদেশে, দিল্লী, পাঞ্জাবের মাঠে-ঘাটে বনে প্রান্তরে অনেক আছে। দেখলে মনে হয় তিতিরের বাচ্চা।

তিতিরকান্নার মাঠ দেখেছো তুমি ? রমাপদ চৌধুরীর বিখ্যাত গল্প আছে একটি ঐ নামের। তিতিরকান্নার মাঠ আছে তোমার বুকেরই মধ্যে—যে কান্নাকে তুমি ভয় পাও, শুনতে চাও না; তাই দৈনন্দিনতার ভারে তাকে বুক চাপা দিয়েই রাখো। প্রত্যেক বিবাহিত মেয়ের বুকেই একটি করে তিতিরকান্নার মাঠ আছে। রুখু, উদাস, বড় বিধুর সেই মাঠ।

আমাদের বটের দুটো থাকবে কাবুক্-এর মধ্যে।

কাবুক্ কাকে বলে জানো ? জানো না তো ! আমি জানতাম যে, তুমি জানবে না। হাতীর দাঁতের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে বানানো বটের রাখার ঘরকে বলে কাবুক। দুটো চনংগ বটের থাকবে দুটো কাবুক্-এ। তোমার একটা, আমার একটা। গজদন্তের কাবুক থেকে বেরিয়ে এসে সাদা মার্বেলের পালীতে ঘুরে ঘুরে লড়বে ওরা।

কি বাজী ধরবে তুমি ?

দাঁড়াও। আমি বলছি।

যদি তোমার বটের হারে, তবে তোমাকে আদর করব আমি সেই রাতে। আর যদি আমার বটের হারে, তবে আমাকে তুমি আদর করবে। তুমি কী জানো একপক্ষ কী করে আদর করে, আর অন্য পক্ষ কি করে আদর খায় ? জানো না। আমি জানতাম যে, তুমি জানো না। শিখিয়ে দেব। সবই শিখিয়ে দেব তোমাকে।

তুমি আমার হও। চিরদিনের। হবে, কিশা ?

যদি বটের লড়ানো তোমার ভালো না লাগে, তাহলে লাল, কী বুলবুল, কী তিতির লড়াবো আমরা। বেগমপসন্দ আঙুর তোমার আঙুরের মতো ঠোঁটে দিতে দিতে সেই লড়াই দেখবে তুমি।

তুমি কী কখনও তোমার মুখ দেখেছো ভাল করে ? তুমি কী জানো তুমি কত সুন্দরী ! তোমার জন্যে বেলজিয়ান আয়না এনে দেবো দেওয়ালজোড়া। তার সামনে বসে তোমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখো তুমি। তোমার সমস্ত তুমিকে ? তোমার চোখ চাওয়াতে যে কত ফুল ফোটে, চোখ মুদলে যে কত ফুল ঝরে যায় তুমি তার কী জানো ?

তুমি জানো না, তুমি কিছুই জানো না। তুমি নিজেকে জানো না, তাই-ই এমন হেলাফেলা করো নিজেকে, এমন অনাদরে অবহেলায় নিজেকে প্রতিমুহূর্তে বঞ্চিত করো।

কি করে পারো কিশা ? কি করে পারো ?

তুমি আমার হবে ! ও কিশা ! তুমি আমার হবে ? এক টুকরো তুমি নও, এক রাতের তুমি নও, তোমার সমস্ত তুমিকে আমায় দেবে কিশা ?

চলে এসো, সব ছেড়ে চলে এসো। আমি তোমাকে আমার সর্বস্বতা দিয়ে ডাকছি, আমার যা আছে সব দিয়ে বড় কাঙালের মত চাইছি তোমাকে।

এসো কিশা, আমার লক্ষ্মী, সোনা, আমার স্বপ্নের কিশা।

আসবে ?

বোধি

চোখে আলো পড়ায় ঘুম ভেঙে গেলো অরির। কাল রাতে কতক্ষণ যে একা একা বারান্দায় বসে ছিল ওর মনে নেই। কত কী ভেবেছে পাগলের মত। কিশা একবার নাইটি পরে এসে বারান্দার আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল।

বলেছিল, আপনি বুঝি কালকের মতই বসে থাকবেন ? কী মজা আপনার। আমি শুতে যাচ্ছি অরিদা। গুড-নাইট ! বলেই, চলে গেছিল ও।

অরির পাশে এসে বসেনি। চলে গেছিল পর্দার আড়ালে। পরদার, পরপুরুষের পাশে এত রাতে একা বসে থাকলে সতীত্ব বিঘ্নিত হয়। সতীত্ব বড় যত্নে, বড় সাবধানে রক্ষা করতে হয় সবসময়। ধুলো বালি, রোদ চাঁদ লাগলেই গেলো। সমাজপতিরা হৈ হৈ করে লাঠি নিয়ে মারতে আসবেন অমনি।

চোখটা জ্বালা জ্বালা করল অরির। তার মানে, একেবারে শেষ রাতে এসে শুয়েছে।

আবার চোখ বুঁজল অরি। আর একটু ঘুমোবে ও। না ঘুমোলে গাড়ি চালাতে কষ্ট হবে এতখানি পথ।

হঠাৎ কানের কাছে শব্দ হল, গুড়ুম গুড়ুম।

অরি চমকে চোখ মেলল।

দেখল্ টুবুল দাঁড়িয়ে আছে তার খাটের পাশে।

রাতে দরজা খোলা রেখেই শুয়ে ছিল অরি। চোরে আর কি নেবে ? টাকা পয়সা জামাকাপড়, এসব চুরি গেলেও আবার করে নেওয়া যায়। সবকিছুই পাওয়া যায়, আবার। কিন্তু অরির যা সবচেয়ে দামী ছিল তার বুকের মধ্যে, সেই হৃদয়ই চুরি গেছে অনেকদিন আগে। ঠিক চুরি যায় নি। রুমি তার সুন্দর ঠোঁটে, সুন্দর আঙুলে, সুন্দর নখে, চামচে করে আইসক্রীম খাওয়ার মত কুরে তার হৃদয়টাকে খেয়ে গেছে। সেখানে একটা বোবা শূন্যতা। সেই শূন্যতা আর ভরবে না কখনও।

একমাত্র ভরাতে পারত কিশা।

কিন্তু, আঃ কিশা !

আবার শব্দ হলো গুড়ুম, গুড়ুম গুড়ুম।

তারপর টুবুল বলল, আমি তোমাকে গুদি কদলাম্। মেলে ফেলেথি তোমাকে। তোমাকে মেলে ফেলেথি আমি।

চোখ মেলে অরি বলল, তুমি কে গো ? অরণ্যদেব ?

না। আমি ফ্যানতাম্। টুবুল বলল।

অরি ওর দিকে তাকালো একবার শুয়ে শুয়েই।

একটা লাল গেঞ্জী আর হলুদ শর্টস্ পরে রয়েছে টুবুল। তার কর্তব্যময়ী সুগৃহিনী মা তাকে চান করিয়ে চুল আঁচড়িয়ে স্ট্র্যাপ সু পরিয়ে জার্নির জন্যে তৈরী করে দিয়েছে। পিকুর পায়জামা পাঞ্জাবী বের করে দিয়েছে মনে হয় এতক্ষণে। নিজেও চান সেরে নিয়েছে নিশ্চয়। হয়ত ভিজে চুল মেলে কোনো মিষ্টি গন্ধের তাঁতের ডুরে শাড়ি পরে বারান্দায় বসে আছে কিশা।

একবার কি এঘরে আসতে পারত না ? ওর চান করে ওঠা উজ্জ্বল মুখটা অরির চোখের সামনে ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফোরা ফুলের মত ফুটে উঠত তাহলে। যদি আসত ! ওর শরীরের গন্ধে, ওর সদ্যস্নাতা চুলের গন্ধে অরির এই ব্যথার ঘর ভরে যেত।

না, না, কিশা যে বিবাহিতা। ও কি তা পারে ?

এমন ঘুমন্ত পর পুরুষের ঘরে এমনভাবে একা একা আসতে নেই ! দিনের আলোতেও নেই। শরীর বড়ই দাহ্য। কখন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে কে জানে ?

শ্বেতকেতু যে কিশাদের সতীত্ব রক্ষার বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করে গেছে !

মনও বড় সাংঘাতিক। শরীরের চেয়েও সাংঘাতিক। লখীন্দরের লোহার বাসর ঘরেও সাপ ঢুকে পড়েছিল—মেয়েদের মনে ভালোবাসার সাপও যাতে না ঢোকে, না ঢুকতে পারে ; সেরও বন্দোবস্তের ত্রুটি করেনি শ্বেতকেতু।

অরি বলল, মা কোথায় ? টুবুলবাবু ?

টুবুল বলল, মা বালান্দায়। তোমাকে ডাকতে বলেতে আমাতে।

ও।

টুবুল বলল, অরিকে ধাক্কা দিয়ে; ওতো বলতি। না উতলে তোমাতে আবার গুলি করব। গুলুম্, গুলুম্, গুলুম্।

অরি শুয়েই থাকল।

ওর উঠতে ইচ্ছে করছিলো না। কেন উঠবে, ওর তাড়া কিসের ?

যাবেই বা কোথায় ও ? ওর তো গন্তব্য নেই কোনো।

অরি আবার বলল, তুমি কে গো ? তোমার কি নাম ?

টুবুল বলল, আমি ফ্যান্তাম।

অরি মনে মনে বলল, না। তুমি অরণ্যদেবও নও, তুমি ফ্যানটামও নয়। আমি জানি তুমি কে। যে আমাকে রোজই গুলি করে মারে, যে বারে বারে আমাকে মেরেছে; তাকে আমি চিনি।

সে তুমি নও। ফ্যানটামও নয়।

তার নাম শ্বেতকেতু।